একটি সুন্নাতকে বাঁচাবো বলে

আতীক উল্লাহ

এক নজরে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এক: আমরা পুরো মুসলিম উম্মাহ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এমনটা যে হবে, নবিজী (সা.) তার জীবদ্দশাতেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। মুসলিম সমাজ আজ নানা দল-উপদলে বিভক্ত। বিভিন্ন বাদ-মতবাদ নিয়ে ব্যস্ত। প্রত্যেক দলই মনে করে করে, তারাই একমাত্র সঠিক দল, অন্যরা সবাই ভ্রান্ত!

দুই: এই যে সমস্যা, তার সমাধানও নবিজী (সা.) দিয়ে গেছেন:
= ইরবাদ বিন সারিয়া বর্ণনা করেছেন:
- নবিজী একদিন আমাদেরকে নসীহত করলেন। ফজরের পর। ভাষণটা ছিল অত্যন্ত সারগর্ভ। উপস্থিত শ্রোতাদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সবার হৃদয় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। একজন তো বলেই বসল:
-এটা তো বিদায়ী ভাষণ!
নবীজি আমাদেরকে কী নির্দেশনা দিয়েছিলেন?
- আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে (নেতার আদেশ) শোনা ও মানার আদেশ দিচ্ছি। সে নেতা হাবশী গোলাম হলেও তাকে মানবে। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অনেক ঝগড়া-বিরোধ দেখবে।
-তোমরা নিত্য-নতুন (বিদআত) বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা সেগুলো ভ্রান্ত। তোমরা যারা সে সময়টা পাবে, তারা যেন আমার সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে। আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত সুবুদ্ধিসম্পন্ন খলীফাদের পথ আঁকড়ে ধরে। তোমরা তাদের পথকে মযবুতভাবে কামড়ে ধরে রাখবে।

তিন: নবিজীর (সা.) কথায় বোঝা গেল, সুন্নাতের অনুসরণের মাঝেই আমাদের মুক্তি নিহিত।

চার: আমরা এই সিলসিলায় চেষ্টা করবো, ফিকহি ও মাযহাবি ইখতিলাফ-মতভেদমুক্ত সুন্নাতসমূহ হাযির করতে। যাতে সবাই মানতে পারে। আমল করতে পারে।

পাঁচ: এই সফরে, আমাদের শে‘আর (স্লোগান) হবে:
-ইন তুতীঊহু তাহতাদু (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا): যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ করো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর:৫৪)।

তাহলীলের সুন্নাত : ১

এক: তাহলীল মানে হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া।

দুই: আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন:
-যে ব্যক্তি দিনে একশ বার: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল-মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর’
(لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،)
বলবে, তার জন্যে আছে:
ক: দশটা গোলাম আযাদ করার সওয়াব।
খ: তার জন্যে একশটা নেকি লেখা হবে।
গ: তার একশটা গুনাহ মাফ করা হবে।
ঘ: তার জন্যে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা হবে।
ঙ: সেদিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমলদার আর কেউ থাকবে না। তবে অন্য কেউ যদি এই আমলটা একাধিকবার করে, তার কথা আলাদা। (বুখারি ও মুসলিম)

তিন: এটি একটি অতীব মর্যাদাবান সুন্নাত। এটার অপরিমেয় প্রতিদানের কথা কল্পনাও করা যায় না। আরেকটা হাদীসের ভাবও এমন:

-আমি (নবিজী) ও অন্য নবীগণ যেসব কথা বলেছি, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা হলো উপরোক্ত দু'আ।

চার: এই সুন্নাত আদায় করতে বড়জোর মিনিট দশেক সময় লাগবে। কিন্তু তার প্রাপ্তি অসাধারণ।
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অন্যকে আহার করানো

এক: অবদুল্লাহ বিন উমার (রা.) বর্ণনা করেছেন:
এক লোক নবিজীকে (সা.) প্রশ্ন করেছে:
-কোন ইসলাম উত্তম?
-তুমি আহার দান করবে। চিনে হোক না চিনে হোক, সালাম দিবে।

দুই: পরিবারের প্রয়োজন পুরো করার পর, উদ্বৃত্ত খাবার থাকলে তবেই অন্যকে আহার করাবে। যেমন: আশেপাশের গরীবকে, বাড়িতে আসা ভিক্ষুককে, মহল্লা পাহারা দেয়া প্রহরীকে, বাড়ির ঠিকা কাজের লোককে।
আবার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, সহকর্মীও এর আওতাভুক্ত হতে পারে।

তিন: হাদীসে গরীব মানুষকেই খাওয়াতে হবে এমনটা বলা হয়নি। বড়লোককে খাওয়ানোও সুন্নাত।

তিন: হাদীসের মূল সুর হলো, পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করা।

চার: সালাম দ্বারাও পরস্পর মিল-মহব্বত সৃষ্টি হয়। উভয় সুন্নাতের মাঝে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে।

আমাদের শি‘আর (স্লোগান) হলো:
- ইন তুতীউহু তাহতাদু (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا): যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ করো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর : ৫৪)।

আযানের পাঁচ সুন্নাহ

এক: আযান দেয়া অনেক বড় ফযীলতপূর্ণ সুন্নাত। এটা শুধু মুয়াযযিনদের ওপরই সুন্নাত নয়, সবার জন্যেই এই সুন্নাত।

দুই: আযানের ধ্বনি কানে এলে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে পাঁচটা আমল করার সুযোগ তৈরী হয়।
এক: আযানের উত্তর দেয়া। নবিজী (সা.) বলেছেন:
-তোমরা যখন আযান শুনবে, মুয়াযযিন যা বলে, সাথে সাথে তোমরাও তা বলো।
= তবে হাইয়া আলাস-সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ-এর উত্তরে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলতে হবে।

দুই: আযান শেষ হলে, নবিজীর (সা.) ওপর দুরূদ পাঠ করাও সুন্নাত। নবিজী (সা.) বলেছেন:

-অতঃপর তোমরা আমার ওপর দুরূদ পাঠ করো। কেননা যে আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর দশবার দুরূদ পাঠ করেন।

তিন: নবিজীর (সা.) জন্যে উসীলা চাওয়া। তিনি বলেছেন:
-অতঃপর তোমরা আমার জন্যে আল্লাহর কাছে উসীলা প্রার্থনা করো। কেননা তা জান্নাতের একটি মনযিল। সেই মনযিলে শুধুমাত্র আল্লাহর এক নির্দিষ্ট বান্দাই যেতে পারবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা। যে আমার জন্যে উসীলা চাইবে, তার জন্যে সুপারিশ করা আমার জন্যে জরুরি হয়ে পড়বে।

চতুর্থ: কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আমাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। নবিজী (সা.) বলেছেন:
-যে আযান শুনে বলবে: আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিলইসলামি দীনান
=তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

পাঁছ: আমরা ইচ্ছেমতো দু‘আ করবো। আল্লাহ চাহেন তো এই দু‘আ কবুল হবে। এক লোক বললো:
-ইয়া রাসুলাল্লাহ! মুয়াযযিনারাতো আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে!
-তারা যা বলে, তুমিও তাই বলো। যখন সবকিছু বলা শেষ করবে, আল্লাহর কাছে চাও, তোমাকে দিয়ে দেয়া হবে।

আমাদের শি‘আর (স্লোগান) হলো:
- ইন তুতীউহু তাহতাদু (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا): যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ করো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর:৫৪)।

=ইয়া আল্লাহ! আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দ্রুত ইফতার করা

এক: নবিজী (সা.) বলেছেন:
-লোকেরা যতদিন পর্যন্ত দ্রুত 'ইফতার' করবে, ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

দুই: সুন্দর-মনোরম একটা সুন্নাহ। রোযা তো রাখতে হয় সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত। ইফতারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে বান্দার বেশি কষ্ট না হয়।

তিন: হাদীসে কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, এটা হলো:
(ক) তাড়াতাড়ি ইফতার করার মাধ্যমে সুন্নাতের বরকত লাভ হচ্ছে।
(খ) দ্রুত ইফতারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি, পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া-সহমর্মিতা প্রকাশ পাচ্ছে।
(গ) এই সুন্নাত আদায় করাটা এতটাই সহজ, শুধু এক টুকরা খেজুর বা এক ঢোক পানি হলেই হয়।

তিন: শুধু ইফতারের সময় হলেই হলো। সাথে সাথে সামান্য কিছু খেয়ে নেয়া।

চার: এর চেয়ে মজাদার আর উপাদেয় সুন্নাত আর কিছু হতে পারে?

*** ইয়া রাব! আমাদেরকে এই সুন্দর সুন্দর, মজার মজার সুন্নাহগুলো নিয়মিত আমলে নিয়ে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইলম তলব করা

এক: নবিজীর (সা.) সবচেয়ে চমৎকার আর মজার সুন্নাত কোনটা?
-আমি বলবো, ইলম তলব করার সুন্নাতটা।
আমরা যখন কিছু পড়ি, তখন খেয়ালই থাকে না, আমরা একটা সুন্নাত আদায় করছি। কী অসাধারণ এক মানুষ আমাদের এই মহানবি। আমাদের প্রতিটা বৈধ কাজকেই তিনি সওয়াবের আওতায় নিয়ে গেছেন।

দুই: আমাদের পেয়ারা নবিজী (সা.) বলেছেন:
-যে ব্যক্তি ইলম তলব করার জন্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথকে সুগম করে দেন।

তিন: আরে কী অসম্ভব সুন্দর একটা কথা! শিখছি আমার প্রয়োজনে, অথচ হাঁটছি জান্নাতের দিকে! কল্পনা করা যায়?

চার: এই সুন্নাতটা আদায় হতে পারে:
(ক) মসজিদে সামান্য সময়ের জন্যে তালীমে বসে।
(খ) নেটের ছোট্ট একটা লেখা পড়ে।
(গ) দেয়ালের এক লাইনের একটা সুন্দর কথা পড়ে।
(ঘ) এমনকি দ্বীনের খিদমাতের উদ্দেশ্যে পড়া ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একেকটা তথ্য জানলেও সুন্নাত আদায় হতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ।
(ঙ) ফেসবুকের একটা দ্বীনি পোস্ট পড়লেও এই সুন্নাত আদায় হবে।
(চ) অডিও-ভিডিও ওয়াজ শুনলেও একটা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

(পাঁচ) জান্নাতে যাওয়া, নবিজীর (সা.) সুপারিশ লাভ করাটা তো খুবই সোজা! আলহামদুলিল্লাহ।

*** ইয়া রাব! আমাদেরকে এই সুন্দর সুন্দর, মজার মজার সুন্নাহগুলো নিয়মিত আমলে নিয়ে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমাদের শি‘আর (স্লোগান) হলো:
- ইন তুতীঊহু তাহতাদু (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا): যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ করো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর:৫৪)।

মুচকি হাসি

এক: কী অবাক করা ব্যাপার! মনের আনন্দে হাসব, তাতেও সওয়াব হবে? হয়তো বা এই একটু হাসি দিয়েই জান্নাতে চলে যেতে পারব?

দুই: নবিজী (সা.) বলেছেন:
-তোমার ভাইয়ের জন্যে তোমার মুচকি হাসিও সাদাকাস্বরূপ।

তিন: আবদুল্লাহ বিন হারেস (রা.) বলেছেন:
-আমি রাসুলুল্লাহর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।

চার: একটু হাসিতেই সমাজের কত কত সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। হাসি যে শুধু আনন্দের সময় দিতে হবে এমন নয়, দুঃখ-শোক-তাপের সময়ও নবিজী (সা.) মুচকি হাসি দিয়েছেন। হি হি হি!

*** ইয়া রাব! আমাদেরকে এই সুন্দর সুন্দর, মজার মজার সুন্নাহগুলো নিয়মিত আমলে নিয়ে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমাদের শি‘আর (স্লোগান) হলো:
- ইন তুতীউহু তাহতাদু (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا): যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ করো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর:৫৪)।

মিলিয়ে দেয়া

এক: নবিজী (সা.) প্রশ্ন করলেন:
-আমি কি তোমাদেরকে রোযা, নামায ও সাদাকার চেয়েও মর্যাদায় উত্তম একটি ইবাদতের কথা বলবো?
-জ্বি, জরুর! ইয়া রাসুলাল্লাহ!
-দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া সম্পর্ককে জোড়া লাগিয়ে দেয়া। কারণ এই (দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া)-টা ধ্বংসাত্মক।

দুই: এই আমলটার মর্যাদা এত্ত বেশি! রোযা, নামায, সাদাকার চেয়েও? এখন থেকে তো তক্কে তক্কে থাকতে হবে।

তিন: আমলটা হতে পারে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল ঘটিয়ে, পিতা-পুত্রের মাঝে মিল ঘটিয়ে, ভাই-ভাইয়ের মাঝে মিল ঘটিয়ে, বন্ধু-বন্ধুর সাথে মিল ঘটিয়ে, প্রতিবেশি-প্রতিবেশির সাথে মিল ঘটিয়ে, এমনকি দু'জন অপরিচিত ঝগড়াটের মাঝে মিল ঘটিয়েও। বাসে ঝগড়া-কুস্তিরত দুই জন মহাপন্ডিতের মাঝে মিল ঘটিয়েও।

চার: এই আমল দ্বারা আমাদের দ্বীন মযবুত হবে। সমাজ মযবুত হবে। পরিবার মযবুত হবে।

= আসুন আগে নিজেদের ঝগড়া মিটিয়ে নেই। আশেপাশের ঝগড়া মিটিয়ে দেই! সুন্নাত যে! নবিজী খুশি হবেন!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে : ৮

খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ

এক: খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। আমর বিন আবু সালামাহ বলেছেন:

-আমি নবিজীর কোলে মানুষ হয়েছি। একদিন খেতে বসে আমার হাত খাবারের থালায় এদিক সেদিক ঘুরছিল। নবিজী বললেন:

-বালক! বিসমিল্লাহ পড়ো। ডানহাত দিয়ে খাও। তোমার সামনে থেকে খাও।

দুই: খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে, তার সংশোধনীরও সুযোগ আছে। নবিজী তার সমাধান দিয়ে দিয়েছেন:

-তোমরা যখন খাবার খাবে, বিসমিল্লাহ পড়বে। (শুরুতে) ভুলে গেলে, পড়বে:

= বিসমিল্লাহি ফি আউয়ালিহি ওয়া আ-খিরিহি।

তিন: বিসমিল্লাহ পড়লে, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় হয়। খাবারে বরকত হয়।

*** ইয়া রাব! আমাদেরকে এই সুন্দর সুন্দর, মজার মজার সুন্নাহগুলো নিয়মিত আমলে নিয়ে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমাদের শি‘আর (স্লোগান) হলো:

- ইন তুতীঊহু তাহতাদু (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا): যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ করো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর:৫৪)।

ওযুর পরে তাশাহহুদ!

এক: অল্প কয়েক শব্দ। অথচ কী শক্তি শব্দগুলোর! জান্নাতের আটটা দরজাই খুলে দিবে। এবার যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, প্রবেশ করো।

দুই: অথচ সময় লাগবে বড়জোর তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড!

নবিজী (সা.) বলেছেন:

-তোমরা যারা ভালভাবে ওযু করে পড়বে:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

তাহলে জান্নাতের আটটা দরজা খুলে যাবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (উকবা বিন আমির রা.। মুসলিম)

তিন: এত সহজে জান্নাত! তাহলে ঠেকায় কে! ইনশাআল্লাহ।

আসুন হাদিয়া দেই

এক: কিছু পেতে সবারই ভাল লাগে। আবার কিছু দিতেও ভাল লাগে। এই দেয়া-নেয়ার পালাটাকেই যদি সুন্নাতের মোড়কে ফেলতে পারি, তাহলে দুনিয়া-আখিরাত দুটোতেই লাভ।

দুই: নবিজী (সা.) বলেছেন:
-তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, তাহলে তোমাদের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

তিন: হাদিয়া দেয়া মানে কি, দামী কিছু? না, সামান্য একটা বস্তুও হাদিয়া হতে পারে। ছোট্ট একটা বই, পাঁচটাকার একটা গোলাব, একটাকার একটা চকলেট, কমদামী একটা কলমও হাদিয়া হতে পারে।
*** দাম-ওজন আর আকার মোটেও মূখ্য নয়, মূখ্য হলো আন্তরিকতা-ভালোবাসা আর সুন্নাতের নিয়্যাত।

চার: আনাস বিন মালিক (রা.) বলেছেন:
-বারীরাহ (রা.) একটুকরা সাদাকার গোশত পেলেন। বারীরাহ সেই গোশত নবিজীকে (সা.) হাদিয়া হিশেবে পেশ করলেন।
নবিজী (সা.) হৃষ্টচিত্তে হাদিয়া গ্রহণ করে বললেন:
-এই গোশত বারীরার জন্যে সাদাকা হতে পারে, কিন্তু আমার জন্যে তা হাদিয়া।

পাঁচ: আসুন আমরা নিয়মিত একে অপরকে অল্প কিছু হলেও হাদিয়া দেই। ভাই তার ভাইকে, ভাই তার বোনকে, বোন তার ভাইকে, সন্তান তার পিতামাতাকে। স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে। শিষ্য তার উস্তাজকে, এমনকি উস্তাজও তার শিষ্যকে হাদিয়া দেই। শত্রু তার শত্রুকে।

= শুধু এই একটি সুন্নাতের মাধ্যমেই আমরা পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে পারি।

ছয়: আমাদের শি'আর (স্লোগান) হলো:
- ইন তুতীঊহু তাহতাদু (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا): যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ কো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর : ৫৪)।

দেরিতে সেহেরী খাওয়া

এক: শুধু রমযানেই যে সেহেরি খাওয়া হয় তা কিন্তু নয়। প্রতি সপ্তাহে দুইদিনও (সোম-বৃহস্পতিবার) কিন্তু রোজা রাখা সুন্নাত।

দুই: যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বলেছেন:
-আমি নবিজীর (সা.) সাথে সেহেরি খেয়েছিলাম। সেহেরি খাওয়ার পর তিনি ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।
সেহেরি আর ফজরের মাঝে বড়জোর পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময়ের ফাঁক ছিল।

তিন: সাহল বিন সা'দ (রা.) বলেন:
-আমি পরিবারের সাথেই সেহেরি খেতাম। তারপরেই নামায ধরার জন্যে দৌড় দিতাম।

চার: দেরি করে সেহেরি খাওয়া সুন্নাত। এতে রোজা রাখার বাড়তি শক্তি সঞ্চিত হয়। তবে বাড়তি শক্তির দিকে মনোযোগ না দিয়ে নবিজীর (সা.) আনুগত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাই উত্তম।

পাঁচ: এমনিতে শুধু সেহেরি খাওয়াই একটা সুন্নাত। নবিজী (সা.) বলেছেন:
-তোমরা সেহেরি খাও, কেননা সেহেরিতে বরকত নিহিত আছে।

= দুইটা সুন্নাত একসাতে আদায় করার দুর্লভ সুযোগ!

ছয়: আমাদের শি'আর (স্লোগান) হলো:
- ইন তুতীঊহু তাহতাদু (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا): যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ করো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর:৫৪)।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে : ১২

সালাম প্রদান!

সমাজে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি ছড়িয়ে দেয়ার সহজতম পন্থা কী? এক কথায় সালামের প্রসার ঘটানো। নবীসি সা. বলেছেন:
-তোমরা মুমিন হওয়া ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পরস্পর ভালোবাসাবাসি ছাড়া মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলবো, কী করলে তোমার পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে? সালামের প্রসার ঘটাও!
(মুসলিম। আবু হুরাইরা র.)।

সালাম দেয়ার জন্যে চিনতে হয় না। চেনা-অচেনা ‘এলোপাথারি’ মারতে হবে। দেদারসে। মুক্তহস্তে। সামনে কোনও কিছুকে পেলেই হলো। সালাম।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামে শ্রেষ্ঠ আমল কোনটা?
-আহার দান করা। চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।

সালাম দেয়ার সময় শব্দ যত বাড়াবো, সওয়াবও বাড়তে থাকবে:
= আসসালামু আলাইকুম: দশনেকি।
= আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ: বিশ নেকি|
= আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু: ত্রিশ নেকি।

ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিবো। কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সালাম দিবো। বাসে উঠার সময় চালককে সালাম দিবো। রিকশায় উঠতে সালাম দিবো। ভাড়া চুকিয়ে দেয়ার পর সালাম দিবো। সিএনজিতে উঠতে-নামতে সালাম দিবো। দোকানে প্রবেশ করে সালাম দিবো। বের হয়ে আসার সময় সালাম দিবো। মোবাইল ধরে সালাম দিবো। রাখার আগে সালাম দিবো। ইনশাআল্লাহ।

আমাদের শি‘আর (স্লোগান)হলো:
(إِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا):
যদি তার অনুসরণ করো, হেদায়াত পেয়ে যাবে (নূর: ৫৪)

রোযাদারকে ইফতার করানো!

একজন ক্ষুধার্তকে খাবার দান করার ব্যাপারটাই অন্যরকম এক আবেগ জাগানিয়া বিষয়। তার ওপর যদি একজন রোযাদারকে ইফতার করানো সুযোগ ঘটে? একসাথে দুই সুন্নাত। এক ঢিলে দুই পাখি। এক পলকে দুই নেক আমল।

রোযাদার গরীব হতে হবে এমন নয়। বড়লোককে ইফতার করালেও সমান সওয়াব হবে। নবীজি সা. বলেছেন:
= একজন রোযাদারকে ইফতার করালে, তার জন্যে সমান সওয়াব লেখা হবে। রোযাদারের সওয়াবও পুরোপুরি বহাল থাকবে।

আমি রোযাদারকে ইফতার করালে কী পাবো? তার সমান সওয়াব পাবো। রোযাদার কেমন সওয়াব পাবে?
= যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখলো, আল্লাহ তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে সত্তর বছরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

জাহান্নামকে দূরে হটাতে কতো খরচ হবে?
= একটা খেজুর। এক ঢোক পানি দিয়েই সেটার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।
০৭/০৩/১৬

আমাদের শি‘আর (স্লোগান):
(إِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا):
যদি তার অনুসরণ করো, হেদায়াত পেয়ে যাবে (নূর: ৫৪)

আত্মীয়তার বন্ধনযুক্তকরণ!

আত্মীয়-স্বজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা। তাদের খোঁজখবর রাখা। আসা যাওয়া করা। বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ানো। শুধু এটুকুই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার সুন্নাতের সীমা?

যারা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে, নিজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে,আগে বেড়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখাও সুন্নাতের আওতায় পড়বে।

নবীজি সা. বলেছেন:
= কোনও প্রতিদান ছাড়া দানকারী প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধনরক্ষাকারী নয়, প্রকৃত বন্ধন রক্ষাকারী হলো: অন্যে সম্পর্ক ছিন্ন করলে, সে আগে বেড়ে সম্পর্ক যুক্ত রাখে! (বুখারী)।

-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে চাইলেও তারা সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্যত হয়! আমি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করলেও তারা দুর্ব্যবহার করে, আমি তাদের প্রতি সহনশীল আচরণ করলেও, তারা রুক্ষè আচরণ করে।
-তুমি যেমনটা বললে, বাস্তবেই যদি তেমন হয়, তাহলে তারা বেশ (মানসিক) কষ্টেই আছে। তবে তুমি যতদিন এই আমলের ওপর থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী তোমার সাথে লেগে থাকবে! (মুসলিম)।

এমন ফযীলত লাভের জন্যে আমরা খুঁজে খুঁজে সম্পর্ক টুটে যাওয়া আত্মীয়দের বের করতে পারি। আমল করতে পারি নবীজির সুন্নাতের ওপর। আখেরে লাভ কিন্তু আমারই! ছোট্ট একটা সুন্নতই আমাকে আখেরাতে বাঁচিয়ে দিতে পারে!

০৮/০৩/১৬

আমাদের শি‘আর (স্লোগান):
(إِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا):
যদি তার অনুসরণ করো, হেদায়াত পেয়ে যাবে (নূর: ৫৪)

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে : ১৫

ফজরের পর বসা!

এখন রাতজাগা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দেরী করে ঘুমুনো, দেরী করে ওঠা সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। যারা নিয়মিত নামায পড়েন, তাদের অনেকেও দেরী করে ঘুমুতে যান। ফলে ফজরর নামাযটা কেউ কেউ ঘুম ঘুম চোখে পড়েন।

ফজর নামায পড়ার পরইএকটা সুন্নাত আছে:
= সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের জায়গায় বসে থাকা। জাবের বিন সামুরাহ রা. বলেছেন:
= নবীজি সা. ফজর নামায পড়ার পর, জায়নামাযে বসে থাকতেন। ভালোভাবে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত (মুসলিম)।

ভালোভাবে সূর্যোদয় মানে, সূর্যোদয় হওয়ার পনের মিনিট পর পর্যন্ত। সুন্নাতটা পালন করতে চাইলে, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে হবে। না হলে ফজর পড়ে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে যাবে।

= যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজর পড়লো তারপর বসে বসে আল্লাহর যিকির করলো। সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত। তারপর দুই রাকাত নামায পড়লো, তার জন্যে একটা হজ ও একটা ওমরার সওয়াব লেখা হবে (তিরমিযী)।

প্রতিদিন সম্ভব না হলেও, সপ্তাহে একদিন অথবা পনেরদিনে একদিন অথবা মাসে একদিন তো আমলটা করার সাহস করা যেতেই পারে।

যাদের হজ্বে বা ওমরায় যাওয়ার সামর্থ্য নেই, তারা আমলটা করার হিম্মত করতে পারি। বলা তো যায় না, আল্লাহ বান্দাহর আগ্রহ দেখলে, আসল হজ-ওমরার তাওফীকও দিয়ে দিতে পারেন! আর হাঁ, এই নামাযকে 'ইশরাকের নামায' বলা হয়। ইশরাক মানে: উদ্ভাসিত হওয়া। মানে সূর্য ওঠা:
-তাহলে বুঝি আমরা সূর্যপূজো করছি?
-নামাযটা কার জন্যে পড়ছি?
-আল্লাহর জন্যে!
-তাহলে সূর্যের কথা আসে কোত্থেকে?

আমার মতো যারা হজ-ওমরার প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ বোধ করেন, কিন্তু কিন্তু.... ! তারা আমলটা করেই দেখতে পারি!

আমাদের শি'আর (স্লোগান):
(إِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا):
যদি তার অনুসরণ করো, হেদায়াত পেয়ে যাবে (নূর: ৫৪)
০৯/০৩/১৬

মজলিসের কাফফারা!

বাঙালির আড্ডা দিতে বসলে আর হুঁশ থাকে! কতো রাজা উযীর যে মরে, তার ইয়ত্তা নেই। আর চা দোকানে বসলে? তাহলে সেরেছে! গ্রামের চা-দোকানগুলো একেকটা যেন জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টার! মার্কিন নির্বাচন থেকে শুরু করে, পাড়ার ফুটবল ক্লাবের সদস্য নির্বাচনী এজেন্ডা পর্যন্ত এখান থেকেই ঘোষিত হয়!
আর ছাদে গিয়ে মোবাইলে ঘন্টা কে ঘন্টা ফিসফিসানি! অথবা ইনবক্সের ইটিস-পিটিস? দু'জন একসাথ হলেই হয়েছে, আগে তো পানের বাটা লাগতো, এখন তাও লাগে না! শুরু হয়ে যায় গীবত-শেকায়েতের ফুলঝুরি! জীবিত-মৃত কোন বাছবিছার নেই!

-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কথার কারণে কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে?
-মু'আয! মুখের কথার কারণেই অনেক মানুষকে উপুড় করে আগুনে ফেলা হবে! (তিরমিযী)।

বাঁচার উপায়? অহেতুক মুখ চালানো বন্ধ করার চেষ্টা করা। ছাগলস্বভাব দূর করার চেষ্টা করা। কথা বলার আগে চেষ্টা করা, আল্লাহ খুশি হবেন তো! তারপরও যদি ভুল হয়ে যায়? পাল্লায় পড়ে কিছু গুলগাপ্পি হয়েই যায়? সমস্যা নেই নবীজি সা. নিদান দিয়ে গেছেন! তিনি জানতেন আমরা দুর্বল!
= যে ব্যক্তি কোনও মজলিসে (বৈঠকে) বসলা, সেখানে অনেক আবোল-তাবোল বকবকানিও হলো, তাহলে সে বৈঠক (চ্যাট/ছাদালাপ/ক্লাসাড্ডা/ক্যান্টিনাড্ডা/অফিসাড্ডা) থেকে ওঠার আগেই পড়ে নিবে:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
এতক্ষণ যা গুনাহ হলো, আল্লাহ মাফ করে দিবেন (তিরমিযী)।

তবে গীবতের গুনাহ মাফ হবে না। সেটা সরাসরি ক্ষমা চাইতে হবে। দু'আটা মুখস্থ করে নিতেই পারি। পাপ থেকে বাঁচতে পারবো না হয়তো। কিন্তু পাপের ভার কিছুটা লাঘব করতে তো পারি! কী পারি না!

উচ্চারণ লাগবে?
-সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে : ১৭

পানির অপচয় রোধ!

আমরা পানি খরচের ব্যাপার সতর্ক থাকি না। ইচ্ছামতো পানির কল ছেড়ে দিয়ে কথা বলি। মিসওয়াক করি। অন্য কাজ করি। পানি পড়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই!
কতো জায়গায় মানুষ এক ফোঁটা পানির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এক ঢোক পানির জেন্য মাইল কে মাইল চষে ফিরছে! আমরা নদীমাতৃক দেশের নাগরিক হওয়াতে পানি সংকট কাকে বলে, টের পাই না। তবে যারা শহরে থাকেন তারা মাঝেমধ্যে হাড়ে হাড়ে টের পান: পানির মূল্য কতো!

নবীজি সা. একদিন সা'দ রা.-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন ওজু করছিলেন। পানি ব্যবহারে অতোটা সতর্ক ছিলেন না:
-সাদ! এ অপচয় কেন?
-ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওজুতেও অপচয়?
-হাঁ, এমনকি তুমি বহমান নদীতেও যদি ওজু করো, সেখানেও অপচয় হতে পারে! (ইবনে মাজা)।

নবীজি পানিকে কতোটা গুরুত্ব দিতেন, সাহাবীকে সতর্ক করা থেকেই কিছুটা আঁচ করা যায়। অথচ তিনিই আবার ভালোভাবে ওজু করতে বলেছেন। অর্থাৎ দুদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

আনাস রা. বলেছেন:
-নবীজি গোসল সারতেন একসা‘ অথবা পাঁচ ‘মুদ’ পরিমাণ পানি দিয়ে (বুখারী)।
সা‘: ৩.৩৬ লিটার।
মুদ: আধা লিটারের চেয়ে কিছু বেশি!

একটু সচেতন হলেই আমরা মহান সুন্নাত আদায়ের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। পাশাপাশি অপচয় রোধ করে, শয়তানের দোসর হওয়া থেকেও রক্ষা পেতে পারি।
১১/০৩/১৬

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ১৮

খতমে কুরআন!

কুরআন কারীম মুমিনের জন্যে রক্ষাকবচ! ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করে:
= নিশ্চয়ই এই কুরআন সর্বাধিক সরল পথের সন্ধান দেয় (ইসরা: ৯)।

কুরআনের বরকত লাভ করতে হলে, হিদায়াত লাভ করতে হলে, নিয়মিত তিলাওয়াত করতে হবে। বোঝার চেষ্টা করতে হবে। পাথরে পাথর ঘষলে যেমন আগুন ধরে, তদ্রূপ কলবের সাথে কুরআনের আয়াত ঘষলেও কলবে হেদায়াতের আগুন ধরবে। আল্লাহর মা‘রেফাতের নূর জ্বলবে।

আমরা গল্প পড়ি। উপন্যাস পড়ি। কবিতা পড়ি। কিন্তু কুরআন পড়ি না। সুযোগ পেলেই যদি গল্পের বই নিয়ে বসতে পারি। ফেসবুক নিয়ে বসতে পারি, কুরআন নিয়েও কিছু সময় বসতে পারবো না কেন?

এখন তো আরও সহজ! মোবাইলেই কুরআন কারীম থাকে। আয়োজন করে কুরআন নিয়ে বসতে হয় না। অনায়াসেই কুরআন পড়া যায়। শোনা যায়।

নবীজি সা. নিয়মিত কুরআন খতম করতেন। জিবরীল আ.-এর সাথে ধরাধরি করতেন। এক খতম শেষ হলে আরেক খতম ধরতেন। এটা সুন্নাত। তিনি বলেছেন:
-অন্তত একমাসে হলেও কুরআন খতম করো (বুখারী)।

হাদীসে বিশদিনে, দশ দিনে, সাতদিনে, তিনদিনে, চল্লিশ দিনে কথাও আছে। যে যারা সামর্থ্য অনুযায়ী খতম করবে। তবে সময় যাই লাগুক, চল্লিশ দিনের বেশি যেন না লাগে। কারণ হাদীসে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের কথা আছে।

= কুরআন তিলাওয়াতে (না বুঝে হলেও) প্রতি হরফে দশ নেকী। আর প্রতিটি নেকী দশগুণ হয়ে আসে (তিরমিযী)।

আমরা প্রতিদিন এক পারা পড়তেই পারি। নিজে না পারলে, অন্তত ত্রিশ মিনিট বরাদ্দ করে, একজন কারী সাহেবের মুখ থেকেও শুনে নিতে পারি। অবশ্য রেকর্ড শুনলে সওয়াব না হওয়ার ফতোয়া দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু না কিছু বরকতও লাভ হবেই।
একটানা সময় না হলে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুনে নিতে পারি। পড়ে নিতে পারি। প্রতি নামাযের আগে বা পরে চার পৃষ্ঠা করে শোনার বা পড়ার নিয়ম করে নিতে পারি।

কুরআন হলো হিদায়াতের আধার। গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়:

-কেউ নিয়মিত কুরআন খতম দিতে অভ্যস্ত হলে, ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি তার আশেপাশে ঘেঁষতে পারবে না। চব্বিশ ঘণ্টায় ‘ত্রিশটা মিনিট’ খুব বেশি কিছু তো নয়! এটা নিজের জানমালের নিরাপত্তার জন্যে ব্যয় করছি বলেও ধরে নিতে পারি! আল্লাহও খুশী। নবীজিও খুশি! দুনিয়া-আখেরাত উভয়টাই নিরাপদ হয়ে গেলো!

প্রথম প্রথম কষ্ট হয়, যে কোনও আমলই একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে, পালতোলা নাওয়ের মতো তরতর এগুতে থাকে! আর থামাথামি হয় না! পালটা তুলতে যা দেরী! আল্লাহ তাওফীক দেয়ার জন্যে তৈরী হয়েই তো আছেন!
১৩/০৩/১৬

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ১৯

ই‘তেকাফ!

ইতেকাফের সবচেয়ে বড় উপকারিতা কী? আত্মনিয়ন্ত্রণ। একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। জীবনচলার পথে একটা ব্রেক এনে দেয়। বিষয়টা কিভাবে বোঝানো যেতে পারে! উমম! হাঁ পেয়েছি, ধরা যাক অত্যন্ত দ্রুতগতির ইন্টারনেটে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ক্লিক করলেই তুরন্ত লোড হয়ে যাচ্ছে। ওকে দিলেই বিড়িত করে দুই মেগা গতিতে ফাইল চলে আসছে। এমন সময়, সরকার নিরাপত্তাজনিত কারণে নেটসেবা বন্ধ করে দিল! তখন কী হয়? অনেক দিন ধরে জমে থাকা ‘এনালগ’ কাজগুলো সেরে নেয়ার একটা চমৎকার সুযোগ তৈরী হয়। বাধ্য হয়েই আরকি!
আথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিদ্যুত-সংযোগ বিচ্ছিন্ন! টিভি নেই। মোবাইল নেই। কম্পিউটার নেই।
অথবা পুলিশের ভয়ে কিছুদিন ‘আন্ডারগ্রাউন্ডে’ চলে যেতে হলো। কোনও রকমের আধুনিক ডিভাইস ব্যবহার করা চলবে না। তখন কী অবস্থা দাঁড়ায়? এতেকাফে বসলেও ঠিক এমনি এক পরিস্থিতি দাঁড়ায়! সারাদিন শুধু ইবাদত-বন্দেগী,

তিলাওয়াত-যিকির, আত্মসমালোচনা, আত্মোন্নোয়ন, আত্মোপলব্ধি চলতে থাকে। অন্য কিছু করার উপায় থাকে না যে!

এতেকাফে বসলে মনের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। মনটা অনেক নির্ভার হয়ে যায়। ঝকঝকে হয়ে যায় মনের চোখ। তকতকে হয়ে যায় মাথার অন্ধিসন্ধি! মনমগজে থাকে মনোরম এক 'তাকওয়া'-র সুবাস!

নবীজি সা. রামাদানের শেষ দশকে ইতেকাফে বসতে ভালোবাসতেন:
= নবীজি রামাদানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন। এই আমল মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল (বুখারী)।
ইতেকাফ শুরু হয় রামাদানের বিশ তারিখে সূর্যাস্তের আগে থেকে ঈদের চাঁদ ওঠা পর্যন্ত! পুরো দশদিন সাহসে না কুলোলেও প্রথম দিকে একদিন-দু'দিন করেই শুরু করা যায়।

অন্য 'আমি'কে আবিষ্কার করতে চাইলে, ইতেকাফের বিকল্প কিছু হতে পারে না। সরাসরি আল্লাহর মেহমান হয়ে যায় যে!
১৪/০৩/১৬

লাইলাতুল কদর!

বছরের সব দিন এক নয়। কিছু কিছু দিনকে আল্লাহ তা'আলা অন্য দিনের তুলনায় বেশি সম্মান দান করেছেন। লাইলাতুল কদরও তেমনি এক রাত:
= লাইলাতুল কাদর হাজার রাতের চেয়েও উত্তম (সূরাতুল কদর: ৩)।

আমরা সারা বছরই আল্লাহর ইবাদত করবো। তবে শবে কদরে অন্য দিনের তুলনায় বেশি ইবাদত করা সুন্নাত। শুধু তাই নয়, এই রাতের অনুসন্ধান করাও আলাদা সুন্নত:
= তোমরা রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদরকে খোঁজ! (বোখারী)

এই রাতটা নামায পড়ে কাটানোই সুন্নত। অন্য ইবাদতও করা যাবে:
= যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে, সওয়াব পাওয়ার আশায় দাঁড়াবে (নামায আদায় করবে), তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

এই রাতে আমরা বেশি বেশি তাহাজ্জুদ পড়বো। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করবো। এ-রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে!
২২/০৩/১৬

আতা'!

আতা মানে দান। দান করা সুন্নাত। নিজেও সুখী অন্যেও সুখী। এর চেয়ে সুন্দর আদর্শ আর কিছু হতে পারে! দান করলে শুধু সওয়াবই পাওয়া যায় তাই নয়, মনে প্রশান্তির প্রলেপ লাগে। দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটে:
= আল্লাহর রাসূলের কাছে কিছু চাইলেই তিনি দিতেন। এক লোক এসে তার কাছে কিছু প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে চরে বেড়ানো কিছু মেষ দিলেন। সে লোক ফিরে গিয়ে বললো:
-হে লোকেরা! ইসলাম গ্রহণ করো! মুহাম্মাদ মুক্তহস্তে দান করে! দারিদ্রের ভয় করে না (আনাস রা.-মুসলিম)।

নবীজি সব সময় তো দান করতেনই, রামাদান এলে দু'হাত খুলে দান করতেন:
= আল্লাহর রাসুল শ্রেষ্ঠতম দানশীল মানুষ। রামাদানে সবচেয়ে বেশি দান করতেন। জিবরাঈল প্রতি রামাদানে নবীজির সাথে সাক্ষাত করতেন। কুরআন দাওর করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ কল্যানবাহী বাতাসের চেয়েও মুক্তহস্ত হয়ে উঠতেন! (মুত্তাফাক: ইবনে আব্বাস।

আমরাও প্রিয় নবীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারি। নিয়মিত দান করতে পারি। শুধু জুমাবারে নয়। ঈদের দিন নয়। আত্মীয়-স্বজন মারা গেলেই নয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও দান করতে পারি।

প্রতিদিন ফজরে ওঠেই কিছু দান করার নিয়ত করতে পারি। সামান্য কিছু হলেও। একটাকা বা একটা খেজুর দিয়ে হলেও।

প্রতিদিন শোয়ার সময় হিশেব নিতে পারি, আজ কি কিছু দান করেছি! এই সুন্নাত আদায় করতে তো বুযুর্গ হতে হবে না। ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে না। দৈনন্দিন আরাম-আয়েশ ছাড়তে হবে না!

দান করে কেউ কোনও দিন দেউলিয়া হয়েছে, এমন নজীর নেই। আল্লাহ নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েই রেখেছেন, দান করলে তিনি বাড়িয়ে দিবেন:
= তোমরা যাই খরচ (দান) করো, আমি তার বিনিময় দিয়ে দেবো! (সূরা সাবা: ৩৯)!
০৫/০৪/১৬

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ২২

জান্নাত নেবে গো জান্নাত?

মাত্র বারো রাকাত পড়লেই জান্নাত। মেগা অফার। আগে এলে আগে পাবেন নয়, এলেই হবে। জান্নাত প্রস্তুত:
-আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাকাত নামায পড়বে, বিনিময়ে তার জন্যে জন্যে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করে রাখা হবে (উম্মে হাবীবা রা.-মুসলিম)।

(এক) আম্মাজান উম্মে হাবীবা রা. বলেছেন:
-হাদীসটা শোনার পর থেকে আমি আর বারো রাকাত ছাড়িনি!
(দুই) আনবাসাহ বিন আবি সুফিয়ান রহ. বলেছেন:
-আমি উম্মে হাবীবা থেকে হাদীসটা শোনার পর থেকে কখনো বারো রাকাত ছাড়িনি!

(তিন) আমর বিন আওস রহ. বলেছেন:

-আমি আনবাসাহর কাছে হাদীসটা শোনার পর থেকে আমলটা বাকী জীবনে আর ছাড়িনি!

(চার) নু'মান বিন সালিম বলেছেন:
-আমি আমর বিন আওসের কাছে হাদীসটা শোনার পর থেকে আমলটা বাকী জীবনে আর ছাড়িনি!

এই বারো রাকাত হলো ফরযের অতিরিক্ত। আরেকটা হাদীসে বিস্তারিত আছে:
= যে ব্যক্তি নিয়মিত অধ্যবসায়ের সাথে বারো রাকাত আদায় করে যাবে, তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ঘর বানিয়ে রাখবেন! যোহরের আগে চার রাকাত। পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পর দুই রাকাত। ঈশার পর দুই রাকাত। ফজরের আগে দুই রাকাত (আয়েশা রা.-নাসায়ী)।

হোয়াইট হাউজের দাম কতো হবে? এই ঘর কেনা সম্ভব? বিক্রি হবে? অসম্ভব চিন্তা। কিন্তু দুনিয়ার তুচ্ছ হাউজের সাথে তুলনাই হয় না এমন একটা হাউজের মালিক বনে যেতে পারি। অনায়াসেই। প্রতিদিন মাত্র বারো রাকাত নামায পড়লেই। এই হাদীসের একটা চমৎকার দিক হলো আগের জন থেকে পরের জন শোনার পর থেকেই আমলটা আর ছাড়েননি!

উক্ত হাদীস সম্পর্কে আমর বিন আনবাসাহ রহ. চমৎকার একটা কথা বলেছেন:
-আনবাসাহ বিন আবি সুফিয়ান মৃত্যুশয্যায় আমাকে বলেছেন: এই হাদীস মনে বড় আনন্দ দেয়। কতো সহজ আমল অথচ কী অবিশ্বাস্য প্রতিদান!

অপটপিক: আনবাসাহ হাদীসটা সরাসরি তার বড় আপির কাছে শুনেছেন! আপ্পির কথা ছোট ভাই কি ফেলতে পারে! উম্মে হাবীবা রা. তার বড়োপি ছিলেন।
০৫/০৪/১৬

ইফতারির সময় দু‘আ!

রোযা একটা চমৎকার ইবাদত। রোযার প্রতিদান আল্লাহ সরাসরি নিজ হাতে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন:
= রোযা ছাড়া প্রতিটি আমলই বান্দার নিজের। রোযা একমাত্র আমার জন্যেই। আর আমিই রোযার প্রতিদান দেবো! (মুত্তাফাক)।

প্রতিদানের একটা নমুনা দেখা যেতে পারে। নবীজি সা. বলেছেন:
-ইফতারির সময় রোযাদারের একটা দু‘আ কবুল করা হবে (বায়হাকী)।
লক্ষ্যণীয় বিষয়, নফল রোযা বা ফরয রোযা সেটা বলা হয়নি। যে কোনও রোযার জন্যেই এই ফযীলত।

উপরের হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. যখন ইফতার করতেন, পরিবারের সবাইকে ডাকতেন। দু‘আ করতেন। তিনি দু‘আয় বলতেন:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ابن ماجه

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেছেন:
= ইফতারির সময় প্রতিটি মুমিনের একটি দু‘আ কবুল করা হয়। সাথে সাথে দুনিয়াতেই কবুল করা হয়, অথবা আখেরাতে দেয়া হয় (বায়হাকী)।

তিনি ইফতারির সময় দু‘আ পড়তেন:
يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي البيهقي

সাহাবায়ে কেরাম ইফতারির সময় দু‘আকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। তারা জানতেন: আল্লাহ তা‘আলা রমযানে প্রতিদিন অনেক মুসলমানকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। হাদীসে আছে:

= আল্লাহ তা‘আলা প্রতিদিন ইফাতারির সময় অনেক জাহান্নামীকে মুক্তি দেন (জাবের রা.-ইবনে মাজাহ)।

ইফতারির সময় দু‘আ করলে বলা যায় না, আমিও মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় এসে যেতে পারি!
১০/০৪/১৬

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ২৪

ইফতারির সময়কার যিকির!

পেয়ারা নবীর প্রতিটি মুহূর্তই যিকিরে-ফিকিরে কাটতো। সারাক্ষণই তিনি তার রবকে স্মরণ করতেন। রবের শুকরিয়া আদায় করতেন। প্রশংসা করতেন।

আর গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে তো নবীজী চমৎকার সব দু‘আ পড়তেন। দু‘আগুলোর অর্থগত সৌন্দর্য তো বটেই, শব্দগত সৌন্দর্যও অতুলনীয়। পড়লেই মনের মধ্যে এক প্রকার দোলা জাগে। আনন্দ তৈরী হয়। অমূল্য কিছু একটা পেয়ে যাচ্ছি বলে মনে হতে থাকে।

নবীজি ইফতারির সময় দারুন এক দু‘আ পড়তেন:
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
= পিপাসা দূর হয়েছে। শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে। আল্লাহ চাহেন তো সওয়াবও সুনিশ্চিত হয়েছে (আবু দাউদ)।

ছোট্ট অথচ এত এত চমৎকার দু‘আ, পড়লেই মনে হয় আহ! শরীর জুড়িয়ে গেলো রে! জান্নাত নিশ্চিত হয়ে গেলো রে!

একটু চিন্তা করলেই কি বেরিয়ে আসে না, দু‘আটা পেয়ারা নবীর জীবনসঞ্জাত? একান্ত জীবনঘনিষ্ঠ? বাস্তব উপলব্ধি থেকে পড়েছেন তিনি? প্রতিটি শব্দ অনুভব করে করে উচ্চারণ করছেন? কী মনে হয় না এমনটা?

وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ
রোযাদারের দুই আনন্দ:
ক: ইফতারির আনন্দ!
খ: তার রবের সাথে সাক্ষাতের আনন্দ!

ওফ! কী অবিশ্বাস্য ইঙ্গিত! রোযা রাখলে রবের সাথে সাক্ষাত হবে! ইয়া আল্লাহ! রোযার প্রতিদানও রাব্বে কারীম নিজ হাতে দেবেন!

কল্পনা করি তো একটু:
= বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধানের হাত থেকে পুরষ্কার নিচ্ছি!
কেমন অনুভূতি? এই অনুভূতিকে অগণিত ট্রিলিয়ন দিয়ে পুরণ দিলে, যে অনুভূতির গুণফল বেরিয়ে আসবে: রোযাদার তার চেয়েও বেশি আনন্দ পাবে!

শুধু কি রামদানের রোযা? উঁহু! প্রতি সোমবার! প্রতি বৃহস্পতিবার! প্রতি আরবী মাসের তের-চৌদ্দ-পনের তারিখে রোযা রাখা সুন্নাত। এছাড়া যে কোনও দিন রোযা রাখলেই হিশেব আগেরটাই থাকবে!

সাগরসম গুনাহের মাফ চাই?

গুনাহের সাগরে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছি? কোনও চিন্তা নেই! মাত্র এক মিনিটেই সমাধান! বিফলে মূল্য ফেরত! এটা আমার কথা নয়, নবীজির!

আমরা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সামনে দাঁড়াই। পাঁচ ফরযে পাঁচবার। নামায শেষ করে সাথে সাথে বের হয়ে গেলে কেমন দেখায়! দুনিয়ার বড় কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলেও, কাজ শেষে চট করে উঠে চলে আসি না।

নামাযের মতো সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঈমানী কাজ সেরে দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া ঠিক মানানসই মনে হয় না। একটুখানি বিরতি দিলেই ব্যাপারটা চোখসহা মনে হয়। সাথে সাথে উঠে গেলে বিশ্রী রকমের দৃষ্টিকটু লাগবে না! স্বার্থ ফুরিয়ে গেছে, ব্যস হ্যাংলার মতো উঠে চলে এলাম? নাহ এটা হতে দেয়া যায় না!

নবীজি এই সময়টাতে ছোট্ট একটা আমল করতেন। খুবই ফলপ্রসূ একটা আমল:
= যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর:
৩৩ বার সুবহা-নাল্লাহ
৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ
৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে।
তারপর নিচের দু‘আ পড়বে:
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
তার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হবে। তার গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও মাফ করে দেয়া হবে (আবু হুরাইরা: মুসলিম)।

দু‘আটার অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ (উপাস্য) নেই। তারই সমস্ত ক্ষমতা। তার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান!

আমলটা এতই সহজ, বড়জোর এক থেকে দেড় মিনিট সময় লাগবে। অল্প পুঁজিতে এত এত মুনাফা! হাতছাড়া করা কি ঠিক হবে!
১৪/০৪/১৬

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ২৬

দু‘আ কবুল হচ্ছে না?

এত দু‘আ করি, কবুল কেন হয় না! সুন্নাত তরীকায় দু‘আ করলে, কবুল হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন নবীজি! দু‘আ করার সুন্নাত তরীকা কী?

ক্ষীণ একটা ধারনা থাকলেও থাকতে পারে কারো কারো মনে: দু‘আটা নামায-রোযার মতো এবাদত নয়। জ্বি না, দু‘আ নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা এবাদত। হাত তুলে বা না তুলে আল্লাহর কাছে যে নিজের চাহিদার কথা বলছি, আমি মূলত এবাদত করছি।

= দু‘আই ইবাদত (তিরমিযী)

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:
-তোমরা আমার কাছে দু‘আ করো। আমি কবুল করবো (গাফির:৬০)।

দু‘আ কবুল হওয়ার অনেক শর্ত আছে। সময় আছে। আদব আছে। আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা আদব বলেই শেষ করবো। ফাদালাহ বিন ওবাইদ রা. বলেছেন:
-নবীজি বসে আছেন। এক লোক এসে নামায পড়লো। তারপর বললো:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي
হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। দয়া করুন!
নবীজি বলে উঠলেন:

-হে মুসল্লি! বড় তাড়াহুড়া করে ফেলেছ! তুমি যখন নামায পড়া শেষ করবে, আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা করবে তারপর আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে তারপর যা দু'আ করার করবে।
একটু পর আরেক লোক এসে নামায পড়লো। আল্লাহর প্রশংসা করলো। নবীজির প্রতি দুরূদ পাঠ করলো। তখন নবীজি বলে উঠলেন:
-হে মুসল্লি! তুমি এবার দু'আ করতে পারো। কবুল করা হবে! (তিরমিযী)।

এই সুন্নাত আদায় করতে হলে একটু সময় বের করতে হবে। সামান্য হলেও চলবে। দু'আর আগে সূরা ফাতিহা বা সংক্ষেপে 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং দরুদ পাঠ করতে হবে। তারপর দু'আ করতে হবে। এভাবে সুন্নাত তরীকায় দু'আ করলে, কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়!
১৫/০৪/১৬

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ২৭

আমলনামার ফিটনেস!

আমরা জেনে না জেনে কতো গুনাহ করে ফেলি! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ:জিহ্বার গুনাহ, চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ! মনের গুনাহ: অহংকার, রিয়া, হামবড়াভাব, হিংসা ইত্যাদি।

আজকাল তো রাস্তায় বের হলে, কী ছেলে কী বুড়ো! সবার কোনও না কোনও গুনাহ হয়েই যায়। গুনাহমুক্ত জীবনযাপন করার দুরূহ ব্যাপার! আল্লাহর খাস তাওফীক ছাড়া এটা সম্ভবও নয়।

আমরা অনেক সময় গুনাহ নয় মনে করেই গুনাহ করে ফেলি। ভাবি এটা ভাল কাজ! অথচ গুনাহ!

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ

আর তোমরা সেটাকে মনে করো হালকা, অথচ সেটা আল্লাহর কাছে বিরাট! (নূর:১৫)।

গুনাহ ধরে ধরে নির্দিষ্ট করে তাওবা করা অসম্ভব এক কাজ। কারণ অনেক গুনাহ আমাদের অগোচরেই হয়ে যায়। জানাও থাকে না আমি গুনাহ করেছি।

এজন্য পেয়ারা নবীজি (সা.)-এর এক অত্যন্ত ফলপ্রসূ আর সময়োপযোগী সুন্নাত হলো: ইস্তেগফার করা। লম্বাচওড়া, বড়সড় কিছু বলতেই হবে এমন নয়। আমরা মাত্র একটা বাক্য উচ্চারণ করেও বিরাট এক আমল করে ফেলতে পারি:

أستغفر الله

আস্তাগফিল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।

নবীজি কিভাবে আমলটা করতেন:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

আল্লাহর কসম! আমি প্রতিদিন কমপক্ষে সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবা করি! (বুখারী)

আরেক হাদীসে একশ বার ইস্তেগফার ও তাওবা করার কথা বলা হয়েছে (ইবনে মাজাহ)।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি

একশ বার বা সত্তরবার পড়তে কতো সময় লাগবে! বড়জোর দু'মিনিট! সারা দিনের ক্লান্তি দূর করার জন্যে আমরা কতো কিছু করি! কোল্ড ড্রিংস, সফট ড্রিংস করি। ব্যায়াম করি। ফিটনেস ঠিক রাখার জন্যে জিমে যাই! পার্কে যাই!
গল্পের ফাঁকে ফাঁকে, দাঁড়ানো থেকে বসতে, বসা থেকে দাঁড়াতে, গাড়িতে বসে, যানজটে থেমে থেকে বিড়বিড় করেও বলতে পারি!
উচ্চারণ করেই পড়তে হবে? মোটেই না। মনে মনেই সেরে নিতে পারি! মাত্র দুইটা মিনিট ব্যয় করে কি আমরা আমলনামার ফিটনেসটা আপডেট করে রাখতে পারি না!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ২৮

খেজুরে সুন্নাত!

আল্লাহর ইবাদত আমাদের কাছে কী দাবী করে? আমরা আল্লাহর আদেশ মানবো কোনও অলসতা ছাড়া। ঝগড়া ছাড়া। দ্বিধা ছাড়া।

আল্লাহ তা'আলা রামাদানের রোযাকে ফরয করেছেন। পাশাপাশি সাদাকাতুল ফিতর দেয়াকেও আবশ্যক করেছেন। পুরো একটা মাস রোযা রাখা ফরয অথচ মাসশেষের পরদিন রোযা রাখাকে 'নিষিদ্ধ' করা হয়েছে। সবদিনই আল্লাহর দিন। একদিন বেশি ফযীলত আরেকদিন কম ফযীলত। একমাস সম্মানিত আরেক মাস কিছুটা কম সম্মানিত, এসব হয়েছে আল্লাহর আদেশে। এই আদেশ মানাকেই 'উবূদিয়্যত' বলে। আল্লাহর আনুগত্য বলে।

নবীজি আল্লাহর আনুগত্যকে ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন। 'ফিতর' অর্থ ফাটানো বা নাশতা করা। সেজন্য ঈদুল ফিতরের দিন নবীজির সর্বপ্রথম কাজই ছিল 'ফিতর' করা। আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তিনি এটা করতেন। কিছু না খেয়ে তিনি ঈদের নামাযে যেতেন না।

আনাস বিন মালিক রা. বলেছেন:
-নবীজি ফিতরের দিন কয়েকটা খেজুর না খেয়ে সকালে ঘর থেকে বের হতেন না (বুখারী)।

= তিনি খেজুর খেতেন বেজোড় সংখ্যায় (আনাস রা.)।

চমৎকার একটা সুন্নাত। কোনও কষ্ট তো নেইই উপরি হিশেবে একটু খানাপিনাও হলো। তাও একটা সুন্নাত নয়, দুই দুইটা:
ক: খেজুর খাওয়া।
খ: বেজোড় সংখ্যায় খাওয়া।
তিনটা। পাঁচটা। সাতটা। সংখ্যা বেজোড় রেখে যতোটা পেটে সয়।
খাও খাও খাও।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ২৯

পথবদলের সুন্নাত!

ঈদ মানে আনন্দ। ঈদ মানে ভালোবাসা। ঈদ মানে বন্ধুত্ব। যোগাযোগ। সৌহার্দ্য। সম্প্রীতি। ঈদে-চাঁন্দে আত্মীয়-স্বজন ঘরে ফেরে। একসাথ হয়। দেখাসাক্ষাত হয়। পুরনো সম্পর্ক নতুন করে জমে ওঠে।

ঈদ মনে একা একা ঘরে বসে থাকা নয়। নিরবে টিভি দেখা নয়। সদর দরজা বন্ধ করে রাখা নয়। ঈদ মানে মোলাকাত। ঈদ মানে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া। একটা হাদীস পড়া যাক:

= নবীজি সা. ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে গেলে ফিরতেন ভিন্ন রাস্তা ধরে (জাবের রা. বুখারী)।

কেন নবীজি এমন করতেন?
= হয়তো তিনি চাইতেন বেশি মানুষের সাথে তার দেখা হোক। নতুন নতুন মানুষের সাথে দেখা হোক। আলি রা. বলেছেন:
= ঈদের দিন সুন্নাত হলো পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া এবং বের হওয়ার আগে কিছু খেয়ে বের হওয়া (তিরমিযী)।

তাহলে নবীজিও বাহনে চড়ে ঈদগাহে যেতেন না। পায়ে হেঁটে যেতেই পছন্দ করতেন। কারণ?
= তাহলে চলার গতি কম হবে। ধীরেসুস্থে হাঁটবেন। বেশি মানুষের সাথে দেখা হবে। কথা হবে। সালাম-কালাম হবে। জনসংযোগ হবে। সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে। ঝগড়া-ফ্যাসাদ কমে যাবে। চক্ষুলজ্জা বেড়ে যাবে। ফলে রেষারেষি কমে যাবে।

মাত্র দুইটা সুন্নাত:
ক: পথ বদল করা।
খ: পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া (যদি কাছেপিঠে হয় আরকি)।
অথচ ফলাফল কত্তো ব্যাপক। কত্তো সুদূরপ্রসারী!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৩০

প্রাণোবন্ধুর বাড়ি!

বর্তমান হলো গতির যুগ। বেগের যুগ। বেগের ধাক্কায় আবেগ হারিয়ে যেতে বসেছে। সবকিছুর পেছনে স্বার্থ কাজ করে। প্রয়োজন কাজ করে। লেনদেন কাজ করে।

আদান-প্রদানের তাকিদ কাজ করে। প্রাপ্তিচিন্তা ছাড়া আমরা একপাও নড়তে রজি নই।

বন্ধুর বাড়িতে কোনও প্রয়োজন ছাড়াই বেড়াতে গেলাম, কেমন হয় ব্যাপারটা? চমৎকার মিষ্টি একটা অভিজ্ঞতা নয় কি? বিকেলে ছাদে বসে গল্প করলাম। পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরলাম। দুপুরে খেয়েদেয়ে একটুখানি গড়িয়ে নিয়ে সাইকেল নিয়ে গ্রামের বাজারের পানে ছুটলাম!

অনেক দিন হলো 'দোস'-এর সাথে দেখা নেই। কথা নেই। যোগাযোগ নেই। সেই কোথায় শহরের শেষমাথার এক কানাগলিতে তার মেসবাড়ি। এক বৃহস্পতিবার অফিস থেকে আর বাসায় গেলাম না, অলিগলি-তস্যগলি পাড়ি দিয়ে চুপিচুপি সেই মেসে হাজির:

-হুয়াহ!

-কিরে তুইইই! স্বপ্ন দেখছি না তো! ভয় পাইয়ে দিয়েছিস! একটু জানিয়ে আসবি না!

যদি বলি এর পুরোটাই সুন্নাত! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! ঠিক আছে হাতেনাতে প্রমাণ হাজির। এক হাদীসে কুদসিতে আছে:

وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ

= আমার ভালোবাসা আবশ্যক হয়ে গেছে:

ক: আমার জন্যেই যারা একে অপরকে ভালোবাসে।

খ: আমার জন্যেই যারা একে অপরের সাথে ওঠাবসা করে।

গ: আমার জন্যেই যারা একে অপরের কাছে বেড়াতে যায়।

ঘ: আমার জন্যেই যারা একে অপরের জন্যে খরচ করে (মুয়াজ বিন জাবাল রা. আহমাদ)।

বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি, পুরো সময়টাই আমি ইবাদতের মধ্যে আছি। জ্যামে আটকে আছি, আমলনামায় সওয়াব লেখা হচ্ছেই হচ্ছে। একে-ওকে বাসার ঠিকানা জিজ্ঞেস করছি, সওয়াব হয়েই চলেছে। আর কিছু লাগে!

আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবীজি মিষ্টি একটা গল্পও শুনিয়েছেন:

= এক দেশে এক লোক ছিল। তার এক ভাই বাস করতে ভিনগাঁয়ে। ভাইকে দেখতে রওয়ানা দিল। আল্লাহ তা‘আলা (করলেন কী, ভাইবৎসল ভালো মানুষটার) পথের ধারে একজন ফেরেশতাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। লোকটা পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় ফিরিশতা শুধালেন:

-কই যাচ্ছ গো!

-ওই যে গ্রাম দেখা যায়, সেখানে আমার এক ভাই (বন্ধু) থাকে, তার কাছে যাচ্ছি!

-তার কাছে কি কোনও পাওনা চাইতে যাচ্ছ?

-না না, তা হবে কেন! আমি তাকে আল্লাহর জন্যে ভালোবাসি, সেজন্যেই তাকে দেখতে যাচ্ছি!

-শোন হে (ভালো মানুষেরপো!) আমি আল্লাহর একজন ফেরেশতা। তোমার জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

-কেন?

-আল্লাহ তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছেন!

-কী কথা? ক্কী কী কথা?

-তুমি যেমন করে তোমার ভাইকে (নিঃস্বার্থভাবে) ভালোবেসেছ, আল্লাহও তোমাকে ভালোবেসেছেন!

(আবু হুরাইরা রা.। মুসলিম। ভাবতরজমা)।

সুন্নতটা এতই সুন্দর! কী আর বলবো!

-তবে!

-তবে কী?

-তবে হলো, আল্লাহর ভালোবাসায় তো বন্ধুর মেসে ড্যাং ড্যাং করে গেলাম। কিন্তু হিপ পকেটে একটা নিরীহদর্শন ষাটজিবি পেনড্রাইভও নিয়ে গেলাম। মনের গহীনে ক্ষীইইইণ একটা ইচ্ছা: ওর মেসে তো আনলিমিটেড নেট কানেকশন আছে, রাতটা ভালোই জমবে! মৌজ-মাস্তি করে দেখেও আসবো, সাথে করে নিয়েও আসবো!

= তাহলে কিন্তু খবর আছে! খেয়াল করলে হয়তো দেখা যেতেও পারে: বন্ধুর মেসের গলির মুখেই জাহান্নামের দারোয়ান ‘মালিক’ ইয়াব্বড় গদা হাতে দাঁড়িয়ে আছে আর বলছে: আয় এদিকে আয়!

-আঁই কিচ্চি?

-আল্লাহ তোকে বলতে বলেছে, তিনি তোর প্রতি ভীষণ নারাজ!

২৭/০৪/১৬

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৩১

ঈদের হাসি!

বছরের সবদিন এক রকম নয়। পুরো সপ্তাহ কাজ করলেও জুমাবারে একটা ঝাড়া হাত-পা হওয়া ভাল। তনুমন একটু বিশ্রাম চায়। বিরাম খোঁজে! দুই ঈদের দিনও আল্লাহর নির্ধারন করা আনন্দের দিন।

নবীজি সা. সবসময়ই হাসিখুশি থাকতেন। ঈদের দিনটাও বেশ হাসিখুশিতে কাটাতেন। পরিবার পরিজনকে সময় দিতেন।

আয়েশা রা. বলেছেন:

= আবু বকর রা. এক ঈদের দিন তার ঘরে এলেন। দুই বালিকা তখন ঘরে গান গাইছিল আর দফ বাজাচ্ছিল। আল্লারহ রাসুল কাপড়মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আবু বকর মেয়েদুটিকে ধমক দিলেন। আল্লাহর রাসুল মুখ খুলে বললেন:

-আবু বকর! থাক আজ তো ঈদের দিন!

আয়েশা রা. আরও বলেছেন:

-আমার ঘরে এক ঈদের দিন দুই বালিকা বু'আস যুদ্ধের গান গাইছিল। আল্লাহর রাসূল ঘরে এসে মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আবু বকর এলেন। ধমক দিয়ে বলে উঠলেন:

-আল্লাহর রাসূলের কাছে শয়তানের বাঁশি!

নবীজি পাশ ফিরে বললেন: থাক, তাদেরকে ছেড়ে দাও!

একটু পরে নবীজি অন্যমনস্ক হলে, ইশারায় মেয়েদুটিকে চলে যেতে বললাম।

ঈদের দিন একদল হাবশী লোক খেলা করছিল। বর্শা নিয়ে। নবীজি জানতে চাইলেন:

-আয়েশা! তাদের খেলা দেখতে মন চায়?

-জ্বি।

নবীজি আমাকে তার পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তার গালের সাথে লেপ্টে ছিল। অনেকক্ষণ উপভোগ করার পর তিনি বললেন:

-হয়েছে?

-জ্বি।

-ঠিক আছে ঘরে যাও তবে! (আয়েশা রা. বুখারী)।

ঈদের দিন নবীজির মতো মানুষও বিবি-বাচ্চাদের সাথে নিয়ে নির্মল মাসিখুশীতে সময় কাটাতেন। তাই বলে এটা মনে করা যাবে না, বর্তমানের বাদ্যি-বাজনাময় গান শোনা ঈদের দিন বৈধ!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৩২

ছয়রোজা!

আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি অসম্ভব দয়াবান। তিনি বান্দার প্রতিটি নেকআমলের প্রতিদানকে দশগুণ বাড়িয়ে দেন:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

নেককাজ করলে তার বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব মিলবে (মর্মার্থ: আনআম ১৬০)।

এই আয়াতের আশ্বাস অনুযায়ী, রামাদানে ত্রিশদিন রোযা রাখার অর্থ হলো: তিনশদিন রোযা রাখা। এখন শাউয়ালে আরো ছয়টা রোজা অতিরিক্ত রাখলে, ষাটদিন রোযা রাখার সওয়াব আমলনামায় যোগ হবে।
সবমিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়াল তিনশত ষাটদিন। পুরো একবছর। কেউ যদি প্রতি বছর রামাদানের ত্রিশ রোযার পাশাপাশি শাউয়ালের ছয়রোজাও রাখে, তাহলে আজীবন রোজা রাখার সওয়াব পাবে।

আমাদের প্রিয় নবীজি সা. এই ছয় রোজা রাখতেন। তিনি বলেছেন:
-যে (নিয়মিত) রামাদানে রোযা রাখলো, তারপর শাউয়ালে ছয়টা রোযা রাখলো, সে যেন আজীবন রোযা রাখলো (আবু আইয়ুব আনসারী: মুসলিম)।

= এই ছয় রোযা পরপর একটানা রাখতে হবে এটা জরুরী নয়। বাদ দিয়ে দিয়েও রাখা যাবে। তবে শাউয়ালের মধ্যে ছয় রোজা শেষ করতে হবে।
= আগে কাজা রাখতে হবে, তারপর ছয়রোজা রাখতে হবে, এটাও ভুল ধারনা।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৩৩

আগেভাগে মসজিদে!

প্রতি সপ্তাহে একটা উট সাদাকা করা ক'জনের পক্ষেই বা সম্ভব? অথবা প্রতি সপ্তাহে একটা করে গরু বা ছাগল সাদাকা করাও সবার সাধ্যে কুলোবে? বেশির ভাগ মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব নয়।

আমরা চাইলে অনায়াসেই এই ফযীলতটা লাভ করতে পারি। কোনওপ্রকার খায়-খরচা ছাড়াই!

= যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন খুব ভালোভাবে গোসল করলো, আগে আগে সবার আগে মসজিদে গেলো, সে যেন একটা বড়সড় উটনী কুরবানি করল।

আর যে ব্যক্তি তারপর মসজিদে গেলো, সে যেন একটা হৃষ্টপুষ্ট গাভী কুরবানী করলো।

আর যে ব্যক্তি তারপরে মসজিদে গেলো সে যেন একটা দুম্বা কুরবানী করলো।

আর যে ব্যক্তি তারপরে মসজিদে গেলো, সে যেন একটা মোরগ কুরবানি করলো।

আর যে ব্যক্তি তারপরে মসজিদে গেলো, সে যেনো একটা ডিম কুরবানী করলো।

ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার জন্যে মিম্বরে উঠে গেলো, ফিরিশতারা আমলনামা লেখা বন্ধ করে দেন। তারাও বয়ান শোনায় মশগুল হয়ে পড়েন (বুখারী-মুসলিম)।

সব সময় যদিও সবার আগে মসজিদে যেতে না পারি, মাসে একবার ‘প্রথম মুসল্লী’ হওয়াকে চ্যালেঞ্জ হিশেবে নিতেই পারি। লাখ টাকা খরচ করে একা একটা উট কুরবানী হয়তো সারাজীবনেও দিতে পারবো না, কিন্তু চেষ্টা করলে, প্রতি সপ্তাহ বা মাসেই এই ফযীলত অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৩৪

সিওয়াক!

সিওয়াক মানে মিসওয়াক করা একটি চমৎকার সুন্নাত। এটা এমন এক সুন্নাত, আদায় করলে, দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকেই লাভবান হওয়া যায়। একজন মুমিনের সব কাজই হবে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার উদ্দেশ্যে। ব্যক্তিগত লাভালাভের দিকে তাকিয়ে নয়।

ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকে নযর রাখে। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই ইসলাম বেশি আগ্রহী। ইসলামের প্রতিটি বিধান পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, কত সূক্ষèভাবে মানুষের সুযোগ-সুবিধের দিকে নযর রাখা হয়েছে!

ইসলাম শুধু নামায-রোযা-জিহাদ-খিলাফাহ নিয়েই ভাবে না, বান্দার ব্যক্তিগত আরাম-সুবিধা নিয়েও ভাবে। **পরিষ্কার**-পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। পবিত্রতার সম্পর্ক ঈমানের সাথে। ইবাদতের সাথে। পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ছাড়া কোনও ইবাদতই গ্রহনযোগ্য হয় না।

আমাদের নবীজি সা.ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। মুখের প্রতি ছিল নবীজির বাড়তি নযর। তিনি নিয়মিত দাঁতের যতœ নিতেন। মিসওয়াক করতেন। এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও মিসওয়াক করেছেন:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ

= যদি আমার উম্মতের কষ্টের আশংকা না থাকতো, তাহলে আমি প্রতি নামাযের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিয়ে দিতাম (বুখারী-মুসলিম)।

আরেক হাদীসে আছে: প্রতিটি ওজুর সময় মিসওয়াকের নির্দেশ দিয়ে দিতাম।

নবীজি আরো বলেছেন:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

মিসওয়াক হলো মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম (বুখারী)।

কী চমৎকার একটা সুন্নাত। নিজের লাভ। অন্যেরও লাভ। অন্যরা আমার মুখের কারনে কষ্ট পাবে না। ফিরিশতারা কষ্ট পাবেন না। মনমেজাযও ফুরফুরে থাকে। ইবাদতে বাড়তি মনোযোগ আছে।

কারো কারো মনে একটা হাস্যোদ্দীপক কৌতূহল জাগে:

-মিসওয়াক বোধ হয় শুধু পুরুষের জন্যে?

-জ্বি না, মিসওয়াক সবার জন্যেই সুন্নাত। নারী-পুরুষে কোনও ভেদাভেদ নেই, এই সুন্নাতের ক্ষেত্রে।

প্রভাতী যিকির!

কথা কম কাজ বেশি। কাজ কম লাভ বেশি। আমল কম সওয়াব বেশি। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে পেলে একজন যা রুজি করে, আরেকজন মাথা খাটিয়ে একমিনিটেই তা রুজি করে ফেলে। দু'জনেরই রুজিই হালাল।

আমরা পেয়ারা নবীর তরীকা অনুযায়ী আমল করি, তাহলে আমরা অল্প মেহনতে অনেক সওয়াবের ভাগীদার হতে পারবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

ওহে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহর বেশি বেশি যিকির করো (আহযাব: ৪১)।

বেশি বেশি যিকির মানে কী? সারাক্ষণ বসে বসে যিকির করবো? উত্তরটা নাহয় নবীজি সা.-এর কাছ থেকেই শুনি। তিনি সুন্দর অথচ অতি সহজ একটা সমাধান দিয়ে গেছেন। সামান্য কয়েক মুহূর্ত সময় লাগবে আমলটা করতে, অথচ সারাদিনের মুজুরী পেয়ে যাবো!

উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া রা.। এক সকালে নবীজি তার ঘর থেকে ফজর নামায পড়তে গেলেন। যাওয়ার সময় দেখে গেলেন, আম্মাজান জায়নামাযে আছেন। বেলা চড়ে যাওয়ার পর নবীজি ফিরে এসে দেখলেন, আম্মাজান তখনো জায়নামাযে!

-তুমি তখন থেকেই এ অবস্থায় আছো?

-জ্বি।

-এসো তোমাকে চারটা 'বাক্য' শিখিয়ে দেই, তিনবার পড়তে হবে। যদি বাক্যগুলোর সওয়াবকে সারাদিন ধরে মাপা যাবে!

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি (তাসবীহ পাঠ করছি) ও তার প্রশংসা করছি:

তার সমস্ত সৃষ্টির পরিমাণসম

তার সন্তুষ্টি লাভের পরিমাণসম

তার আরশের ওযনসম
তার সমস্ত বাক্য লেখা কালিসম (মুসলিম)।
উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদা খালকিহি, ওয়া রিদা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা আরশিহি, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহি

ইয়া আল্লাহ! কত্তো অল্প সময়ে এ-বাক্যগুলো তিনবার পড়ে ফেলতে পারি! প্রতিদিন প্রভাতী সমীরণের শীতল ছোঁয়ায়?

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৩৬

ঘুমের আগে 'হামদ'!

আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার কতো নেয়ামত! রাশি রাশি নেয়ামত আর অনুগ্রহের মাঝে আমরা ডুবে আছি। এর বিনিময়ে প্রথমত আমাদের কর্তব্য কী?
-আল্লাহর শোকরগুজার হওয়া। আল্লাহর হামদা-সানা পড়া।
কিন্তু আমাদের তা মনেই থাকে না। আমরা বেশির ভাগ সময়ই, আমাদের কী কী নেই তার ফিরিস্তি খুলে বসি। কতো কিছু যে আমাদের আছে, সেটার কথা বেমালুম ভুলে বসে থাকি:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ
নিশ্চয়ই আপনর রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহের অধিকারী, তাদের কিন্তু অধিকাংশই শুকরিয়া আদায় করে না (নামল: ৭৩)।

আমরা তো পারি মাঝেমধ্যে চুপচাপ থেকে, আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের কথা চিন্তা করতে। শুকরিয়া আদায় করতে:
وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ
আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগুজার বান্দা খুবই কম (সাবা:১৩)।

এই আয়াতে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ আছে! ভর্ৎসনা আছে। ধিক্কার আছে। আমরা নিয়মিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, আয়াতের আওয়াত থেকে বের হতে পারি। হতে পারি আল্লাহর প্রিয় শোকারগুজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। হতে পারি অল্পসংখ্যক 'বিশেষ' বান্দা!

সারাদিনে আর যাই হোক, আমরা ঘুমের সময়, আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা কি হতে পারি না? আমাদের পেয়ারা নবীজি সা.-এর আদর্শও তাই! তিনি 'হামদ' পড়ে ঘুমুতেন। হাবীব সা.-এর দিনটা শেষ হতো 'হামদ'-এর মাধ্যমে!
আমরাও পারি দিনের পাটটা আল্লাহর 'হামদ' দিয়ে চুকোতে পারি! নবীজির সার্বক্ষণিক খাদেম আনাস রা. বলেছেন:
নবীজি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলতেন:
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا
আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আতা'আমানা ওয়া সাকা-না ওয়া কাফা-না ওয়া আ-ওয়ানা!
এরপর নবীজি বলেছেন:
-কতোজন আছে, যাদের দেখাশোনার কেউ নেই, আশ্রয়দাতা নেই! (মুসলিম)।

মাত্র সাতটা তো শব্দ! দু'তিন সেকেন্ডেরই তো ব্যাপার! অথচ এর মাধ্যমে হাদীসের ওপর আমল হয়ে যাবে, কুরআন কারীমের আয়াত অনুযায়ী শোকরগুজারদের 'বিরলতম' তালিকায় নাম উৎকীর্ণ হবে! তাহলে শুরু করা যাক! আলহামদুলিল্লাহ!

মিঠাই সুন্নাত!

দোকানে গিয়ে কাটারিভোগ, ছানাবালুশা, সন্দেশ, ক্ষীর, মোহনভোগসহ আরও নাম না জানা অসংখ্য নামজাদা মিষ্টি খাব, পাশাপাশি সওয়াব হতে থাকবে! কল্পনা করা যায়! উমমম!

আম্মাজান আয়েশা রা. বলেছেন:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ
নবীজি মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধু প্রছন্দ করতেন (বুখারী-মুসলিম)।

'মিষ্টি' শব্দটা শুনলে বা কল্পনা করলেই কেমন যেন আরাম আরাম স্বাদ অনুভূত হতে থাকে। চোখে ভাসতে থাকে শাদা শাদা গোল গোল নাদুস নুদুস এক আদুরে ছবি! মিষটি!

মিষ্টি দেখলে অনেক সময় খাট্টা মেজাযও মিঠঠা হয়ে ওঠে। প্রসন্ন হাসিতে দন্ত বিকশিত হয়ে ওঠে। মিষ্টির রসালো ছোঁয়ায় সৃষ্টি হয়ে ওঠে রসিক।

নানা উপলক্ষ্যে আমরা টসটসে মিষ্টি খাই। একটু খেয়াল করলেই 'উদরপূর্তি'-এর সাথে সাথে আমলনামাপূর্তিরও ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা নিয়ত করে নিতে পারি:
-নবীজি মিষ্টি খেতে ভালবাসতেন। তাই আমিও.....!

ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণতই স্বভাবধর্ম। প্রতিটি বিধানই মানবস্বভাবের সাথে সঙ্গতি রাখে। মিষ্টি খেয়ে সওয়াব লাভের ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

নবীজি যা পছন্দ করেছেন, তা আমরা পছন্দ না করে পারি! আমরা বেশি বেশি মিষ্টি খাবো। মিষ্টি হাদিয়া দেবো। শুধু নিয়তটা ঠিক করে নিলেই হবে:

-আমি সুন্নাত আদায়ের জন্যে খাচ্ছি! দিচ্ছি!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৩৮

অল্পকথার সুন্নাত!

উত্তম চরিত্র কী? নানাজন নানা ব্যখ্যা দিবেন। চিন্তা ও রুচিভেদে বক্তব্যও ভিন্নতা পায়। আমাদের কাছে নবীজির বক্তব্য থাকতে অন্য কারো কথা শোনার প্রয়োজন নেই। নবীজি সা. বলে গেছেন:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ

কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে তোমাদের মধ্যে সেরা উত্তম চরিত্রের অধিকারীরা।

কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি এবং আমার চেয়ে দূরে অবস্থান করবে, অধিক কথা বলা ব্যক্তিরা, অহংকারকারীরা (তিরমিযী)।

এতে কোনও সন্দেহ নেই, যে বেশি কথা বলে, তার ভুলও বেশি হয়। উমার রা. বলেছেন:

-যে বেশি কথা বলে, সে ভুলও বেশি করে!

ফুযাইল বিন আয়ায বলেছেন:

-মুমিন কথা কম বলে, কাজ বেশি করে। মুনাফকি কথা বশেি বলে, কাজ কম করে।

নবীজি সা. বলেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা চুপ থাকে (বুখারী)।

কথা কম বলা মানে, অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা। অহেতুক গল্পগুজব না করা, জরুরী কথা না বলে চুপ থাকা নয়।

বেশি কথা বললে আমল করার, ইবাদত-বন্দেগীর ইচ্ছাও হালকা হয়ে যায়। তিলাওয়াতের পরিমাণ কমে যায়। যিকিরে মতি আসে না। দুষ্ট মন শুধু কথা বলার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়!

অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে থাকতে পারা অনেক বড় একটা গুণ। চমৎকার এক বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি এটা প্রিয় নবীজির অপূর্ব এক সুন্নাতও বটে।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৩৯

পানি পান!

নবীজি সা.-এর সুন্নাত ও আদর্শ জীবনের প্রতিটি দিককে ছুঁয়ে আছে। এখানেই তার সাথে অন্য নেতাদের ফারাক। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে একান্ত ব্যক্তিগত কাজেও আমরা ‘সুন্নাত’ খুঁজে পাই।

পানি পান করারও সুন্নাত তরীকা আছে। কিভাবে পান করতে হবে, সেটা নবীজি আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। আমরা অনেকেই পান করার সময়, মুখে গ্লাসটা লাগিয়ে পান করা শুরু করি। একেবারে গ্লাস শেষ করে তবে গ্লাসটা মুখ থেকে আলগা করি।

না এটা নবীজির আদর্শ নয়। একবারে পুরো গ্লাস পান করলে অনেক সময় দেখা যায়, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পান করা হয়ে যায়। গ্লাস খালি করা তো উদ্দেশ্য নয়, পিপাসা মেটানো উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্লাস খালি করার জন্যেই যেন পান করি।

এটা ঠিক বেশি বেশি পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল। কিন্তু সব সময় বেশি পানি পান করা নিশ্চয় উপকারী নয়। বেশি পানি পান করারও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

বেশি পিপাসার সময় তাড়াহুড়ো করে গ্লাস খালি করতে গিয়ে 'বিষম' লেগে দমও আটকে আসতে পারে। কাশিও উঠে যেতে পারে। এক্ষেত্রে নবীজির সুন্নাতও আমাদের জন্যে শ্রেষ্ঠ সমাধান। তিনি সব সময় তিনঢোকে পানি পান করতেন। একঢোক পান করতেন তারপর গ্লাসকে মুখ থেকে সরিয়ে নিতেন। তারপর আবার চুমুক দিতেন। এভাবে তিনবার। প্রত্যেকবার চুমুক দেয়ার পর একটা শ্বাস গ্রহণ করতেন। তারপর পাত্রে মুখ দিতেন। তবে নিশ্বাসটা পানপাত্রে ফেলতেন না। মুখকে দূরে সরিয়ে তবেই নিশ্বাস ফেলতেন।

আনাস রা. বলেছেন: নবীজি তিনঢোকে পানি পান করতেন। এবং বলতেন:
-এ পদ্ধতিতে পানি পান করাটা অধিক তৃপ্তিকর, অধিক স্বাস্থ্যকর, অধিক সুন্দর! (মুসলিম)।

আমরা চাইলেই সুন্নাতটা আদায় করতে পারি। দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকেই লাভবান হতে পারি।

শক্তিমান মুমিন!

দুর্বলদের দিয়ে কখনো কিছু হয়েছে? সবল আর তৎপর লোকেরাই কাজের। তারাই সমাজের চালিকাশক্তি। তাদের হাত ধরেই উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়। সবল মানে জব্বার বলীর মতো ইয়াব্বড় 'পাহলোয়ান' হতে হবে এমন নয়। সবল মানে সুস্থ সজাগ কর্মঠ মানুষ।

নবীজি দুর্বল মুমিনের চেয়ে সবল মুমিন বেশি পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন:
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ
প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই (কিছু না কিছু) কল্যাণ আছে, তবে আমার কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে সবল মুমিনই বেশি প্রিয় (মুসলিম)।

সবল মানে আবার এটাও নয়, প্রতিদিন জিমে গিয়ে গাব্দাগোব্দা মাসল বাইসেপ বানানোর কসরৎ করা। মাসল বানানোটা যদি সুন্নাত আদায়ের জন্যে হয়, তাহলে কথাই নেই, কিন্তু স্কিনটাইট গেঞ্জি পরে ও ততোধিক টাইট জিন্স পরে, ¯্রফে দেখানোর জন্যে মাসল বানানো 'ভাল কাজ' নয়।

শক্তিমান মুমিনকে নবীজি পছন্দ করেন, কারন সে বেশি বেশি ইবাদত করতে পারবে, জিহাদে অংশ নিতে পারবে, জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে। বিকটা আওয়াজে বাইক চালিয়ে 'বডি' দেখিয়ে বেড়ানোর জন্যে নয়। সুযোগ পেয়েই 'শার্ট' খুলে বুকের ছাতি দেখানোর জন্যে নয়।

নবীজি সব ধরনের দুর্বলতা থেকে বাঁচার দু'আ করতেন:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও শোক থেকে পানাহ চাই। অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাই। কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাই। বুকভাঙা ঋণ ও শক্তিমানের আধিপত্য থেকে পানাহ চাই! (বুখারী)।

আমরা দু'আটা মুখস্থ করে রাখতে পারি। সুন্নাতও আদায় হবে, বিপদাপদ থেকেও বেঁচে থাকা যাবে। সময় পেলে, সমস্যা দেখা দিলে পড়তে পারবো।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৪১

বউসেবী সুন্নাত!

কিছু সুন্নাত আছে, আদায় করলে সমাজে পারিবারিক অশান্তি বলে কিছু থাকবে না। চারদিকে সুখ আর সুখের নহর বইতে থাকবে। স্ত্রীর সম্মান করা, সংসার নিয়ে তার উদয়স্ত খাটুনির স্বীকৃতি দিতে পারা, একজন স্বামীর বড় গুণ।

কিন্তু মৌখিক প্রশংসার পাশাপাশি সরাসরি হাত লাগিয়ে সহযোগিতা করাও কিন্তু সুন্নাত। এক-দু'দিনের সুন্নাত নয়, নবীজি সা.-এর নিয়মিত প্রাত্যহিক আমল। আম্মাজান আয়েশাকে প্রশ্ন করা হলো:

-নবীজি ঘরের সময়টা কী করে কাটাতেন?

-তিনি ঘরের মানুষের কাজে হাত লাগাতেন। সেবাযত্ন করতেন। টুকিটাকি কাজ করতেন। নামাযের সময় হলে মসজিদে চলে যেতেন (ভাব তরজমা। বুখারী)।

স্বামীরা বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ঘরে ফেরেন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে। তারপরও তারা যদি নবীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, স্ত্রীর কাজে এগিয়ে যান, সঙ্গীনির মনটা নিশ্চয় কৃতজ্ঞবোধে আপ্লুত হয়ে উঠবে। নামকাওয়াস্তে নয়, বাস্তবিকই যদি সামান্য হলেও

রান্নাঘরের কাজে, সামান্য সময় দেয়া হয়, একমিনিটের জন্যে হলেও, সংসারের রঙই বদলে যাবে।

পাঁচমিনিট সময় কিন্তু খুব বেশি নয়, যে কারো পক্ষে সম্ভব। পরিমাণে অল্প কিন্তু ফল বয়ে আনবে পাঁচঘণ্টারও বেশি। একটা প্লেট ধুয়ে দেয়া। বিছানাটা ঝেড়ে দেয়া। মশারীটা টাঙিয়ে দেয়া। ফাঁক করে ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে দেয়া। একটু খানি 'ছোট' বাচ্চাটাকে সামলে-সুমলে রাখা। এসবকিছু নবীজিও করেছেন তাই আমিও করবো, এমন চিন্তা নিয়ে করলে, দ্বীনও হলো আখিরাতও বাদ পড়লো না।

নিজে না পারলে, সুন্নাত আদায়ের নিয়তে একজন ঠিকে সহকারীনি নিয়োগ দিয়ে হলেও হলেও টেনেটুনে কাজ চালানোর কসরত করা যেতে পারে।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৪২

আমি রাজি!

নবীজি সা.-এর হাদীস পড়ার সময় মাঝেমধ্যে একটা চিন্তা আমাদের খেয়াল থেকে ছুটে যায়:
-আমি যা পড়ছি, সেটা নিছক তথ্যগত জ্ঞান নয়, জীবনে ধারন করার মতো একটা আদর্শও বটে। বরং দ্বিতীয়টাই মূখ্য।

জীবনসফর শেষ করে আমরা সবাই কবরেই যাবো। এটা অমোঘ, খন্ডানো সম্ভব নয় কারো পক্ষেই। কবরে গেলেই দু'জন ফিরিশতা আসবে। তিনটা প্রশ্ন করবে। তিন প্রশ্নের উত্তরেই জীবনের সারাৎসার বেরিয়ে পড়বে। বারা বিন আযিব রা. বলেছেন: নবীজি দুই ফিরিশতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তারা এসে প্রশ্ন করবে:
مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟

তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে? (আবু দাউদ)।

বাহ্যিকভাবে দেখলে বেশ নিরীহ প্রশ্ন। কোনও জটিলতা নেই। সারল্যে ভরা। বাস্তবে ব্যাপারটা এমন নয়। আল্লাহ সহজ করে না দিলে, সেদিন কারো পক্ষে টু'শব্দ করার শক্তি থাকবে না।

-কার জন্যে সহজ করে দিবেন?
-যে পার্থিব জীবনে এই তিন বিষয় নিয়ে মশগুল ছিল, তার পক্ষেই কবরে গিয়ে গড়গড় করে উত্তর বলে দেয়া সম্ভব হবে!
এজন্যই নবীজি আমদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আমরা যেন উক্ত বিষয়ত্রয় নিয়মিত বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি:
مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَأَنَا الزَّعِيمُ لآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ
যে ব্যক্তি সকালে বলবে: আমি আল্লাহকে রব হিশেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি, ইসলামকে দ্বীন হিশেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি, মুহাম্মাদকে নবীরূপে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি
= আমি তার যিম্মাদার হয়ে যাবো। হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত থামবো না (তাবারানী)।

আরেক হাদীসে আছে:
-যে সন্ধ্যায় (উক্ত বাক্যগুলো) পড়বে, আল্লাহর ওপর 'হক' দাবী হয়ে পড়বে, তাকে সন্তুষ্ট করা! (তিরমিযী)

কী সহজ সুন্নাত, আমাদেরকে কবরে দৃঢ়পদ রাখবে। জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আল্লাহ নিজেই তাকে সন্তুষ্ট করবেন আখেরাতে!

বাক্যগুলোর উচ্চারণ: রাদীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিল-ইসলা-মি দ্বীনান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যান।

জাযা-কাল্লাহু খাইরান!

আমাদের ইসলামে দুই ধরনের ‘ইবাদত’ আছে। কিছু আছে আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল আমাদের জন্যে আবশ্যক করে দিয়ে গেছেন। সেগুলো আদায় করতেই হয়, নইলে গুনাহ হয়। পরকালে শাস্তির ভয় থাকে। আর কিছু আমল আছে, করলে সওয়াব না করলে গুনাহ নেই।

ধড়পাকড় না থাকলেও, ঐচ্ছিক আমলগুলোর শক্তি ও উপকারিতাও কিন্তু কোনও অংশে কম নয়। ক্ষেত্রবিশেষে ‘নফল’ আমলগুলোর তাৎক্ষণিক ফলাফল বেশিই দেখা যায়। তার মানে এটা বোঝাতে চাচ্ছি না, ফরযের চেয়ে নফলের গুরুত্ব বেশি! নফলের ফলটা হাতেনাতে পাওয়া যায় অনেক সময়।

বেশির ভাগ ফরয ওয়াজিবের সম্পর্কই সরাসরি আল্লাহর সাথে। কিন্তু নফল ও আখলাক সম্পর্কিত ইবাদতগুলোর প্রাথমিক ও বাহিক সম্পর্ক বান্দার সাথে।

কেউ আমার প্রতি সুন্দর আচরণ করলো, আমি ন্যূনতম তার জন্যে কী করতে পারি? তার শুকরিয়া আদায় করতে পারি। ধন্যবাদ জানাতে পারি।

তার ভালো আচরণের প্রত্যুত্তরে আমি যদি চুপচাপ বসে থাকি, সেটা দেখতেও সুন্দর হয় না, সুন্নাত নয়। আমি যদি কাজটার জন্যে হাসিমুখে শুকরিয়া আদায় করি, এতেও ভাইটা উৎসাহ পাবে। তার উপকারী মনটা আরো বেশি উপকারে উৎসাহী হবে। এটা ঠিক, খাঁটি মানুষ করো প্রতিদান বা প্রশংসার প্রত্যাশী হয়ে কিছু করে না, তবুও একটুখানি হাসি, একটুখানি স্বীকৃতি পেলে, মনের বল নিশ্চয় বেড়ে যাবে! প্রশংসা পেলে ভাল লাগা, উৎসাহ পাওয়া মানুষের জন্মগত স্বভাব। বেসামাল না হয়ে পড়লে, প্রশংসায় খুশি হওয়া খারাপ কিছু নয়।

মানুষের প্রতি শোকরগুজার থাকা সুন্নাত। নবীজি বলে গেছেন:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

যে মানুষের শোকর আদায় করে না, আল্লাহরও শোকর আদায় করে না (তিরমিযী)।

পেয়ারা নবী এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি, কিভাবে শোকর আদায় করতে হবে, সেটাও খুলে বলে দিয়ে গেছেন:

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا. فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ

যার প্রতি সুন্দর আচরণ করা হলো, (তার উত্তরে) সে বললো: জাযাকাল্লাহু খাইরান (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন)! যে চূড়ান্ত রকমের প্রশংসা করলো!

এরচেয়ে সুন্দর আদর্শ হতে পারে? আমাদের মধ্যে শুকরিয়া-স্বীকৃতি সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। কিন্তু অন্যদের মধ্যে ঠিকই 'থ্যাংকিউ-সংস্কৃতি' গড়ে উঠেছে! বেশ ভালভাবেই গড়ে উঠেছে! আমরা কেন পিছিয়ে পড়বো! তবে সামনে থাকার জন্যে 'থ্যাংকিউ-সংস্কৃতিতে' আবার অভ্যস্ত হয়ে পড়বো না!

= আমরা 'সুন্নাতী-তাহযীবে' অভ্যস্ত হয়ে উঠবো!

= আমরা জাযা-কাল্লাহু খাইরান-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবো!

= আমরা রিকশাচালককে বলবো: জাযা-কাল্লাহু খাইরান!

= আমরা বাড়ির খাদেমকে বলবো: জাযা-কাল্লাহু খাইরান!

= আমরা বাসের হেল্পারকে বলবো: জাযা-কাল্লাহু খাইরান!

= আমরা বন্ধুকে বলবো, ভাইকে বলবো, বোনকে বলবো, স্ত্রীকে বলবো, সন্তানকে বলবো, বাবা-মাকে বলবো, উস্তাদকে বলবো, ছাত্রকে বলবো, মুয়াযযিনকে বলবো:

- জাযা-কাল্লাহু খাইরান!

প্রথম প্রথম লজ্জা লাগবে কিন্তু! দুয়েক দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে! ইনশাআল্লাহ!

প্রারম্ভিকী!

সালাত কী? সালাত হলো রব ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন। সালাতে দাঁড়িয়ে আমরা মূলত আল্লাহর কাছেই হাজিরা দেই। সব সময় হয়তো মনের ভাব ও অনুভূতি এক থাকে না, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে অবশ্যই ভিন্ন এক ভাললাগা জন্ম নেয়:
-আমি আমার রবের সামনে দাঁড়িয়েছি!

আল্লাহ তা‘আলার সামনে দাঁড়ানোর কিছু প্রাকপ্রস্তুতি থাকে। মানসিক সচেতনতা দরকার হয়। যাচ্ছেতাইভাবে ওজু করে হুটহাট সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়। নবীজি সা. শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আমরা যেন আল্লাহর মুখোমুখি দাঁড়ানোর আগে নিজেকে একটুখানি হলেও ভব্যসভ্য করে নেই। নিজের ভেতরটাকে সামান্য হলেও পরিচ্ছন্ন করে নেই।

আবু হুরাইরা রা. বলেছেন: নবীজি সা. সালাতের প্রথম তাকবীর বলার পর কেরাত শুরু করার আগে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন, আমি বললাম:
-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি চুপ থাকেন কেন?
-আমি তখন একটা দু‘আ পড়ি:
اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ
হে আল্লাহ! আমার মাঝে ও পাপের মাঝে পূবপশ্চিমের সমান দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন!
ইয়া আল্লাহ! শাদা কাপড়কে ময়লামুক্ত করার মতো আমাকেও পাপমুক্ত করে দিন!
ইয়া আল্লাহ! আমার পাপরাশিকে পানি-বরফ-শিশির দিয়ে ধুয়েমুছে দিন! (বুখারী-মুসলিম)।

মহান রবের সামনে স্বচ্ছ হয়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি হিশেবে দু‘আটা সত্যিই অসাধারন। সালাতের পর আবার গুনাহ করবো কি করবো না, সেটা ভিন্ন ব্যাপার! কিন্তু এই

মুহূর্তে নিজেকে পাপমুক্ত করে রবের সামনে দাঁড়ানোটাই মুখ্য। উক্ত দু‘আ পড়াটা তারই চমৎকার একটা প্রয়াস! তদুপরি দু‘আটা পড়লে নবীজির একটা সুন্নাতও আদায় হবে! কম কথা! আর দু‘আটার ভাষ্যগুলো সত্যি সত্যি ফলে গেলে বা কবুল হয়ে গেলে, কেমন দাঁড়াবে ব্যাপারটা? উফ! আমি পুরোপুরি পাপমুক্ত-নিষ্কলুষ হয়ে সালাত থেকে বের হলাম! আহ! মুক্তি!

আল্লাহুম্মা! বা‘-ইদ বাইনী ওয়া বাইন খাতা-য়া-য়া কামা বা-‘আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা! নাক্কিনী মিনাল খাতা-য়া-য়া কামা ইউনাক্কাস-সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ্দানাস। আল্লাহুম্মা! ইগসিল খাতা-য়া-য়া বিলমা-য়ি ওয়াস-সালজি ওয়াল-বারাদ!

সালাতের শুরুতেই এমন একটা ব্রেকথ্রু দু‘আ হলে, বাকী সফরটা কেমন হবে!

বলাবাহুল্য এই দু‘আ পড়া আবশ্যক কিছু নয়, না পড়লেও সালাত হয়ে যাবে। বিভ্রান্তির অবকাশ নেই।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৪৫

সুন্নাতে ঊষা!

কেয়ামত যতই কাছিয়ে আসছে, সমাজের রাতের ঘুম ততই পেছাচ্ছে, অবধারিতভাবে পরদিন ঘুম থেকে জাগাও পেছাচ্ছে। অফিসে যাওয়ার তাকিদ না থাকলে দুপুরের আগেও এই সমাজ জাগতো কি না সন্দেহ। পরদিন চাকুরিতে যাওয়ার দায় না থাকলে শেষরাত পর্যন্তও ‘পাপ’ অব্যাহত থাকতো!

নবীজি সা.-এর অভ্যেস ছিল অতি ভোরে উঠে যাওয়া। তার দিন শুরুই হতো ফজরের আগে। তাহাজ্জুদ ছিল তার নতুন দিনের প্রথম ‘আমল’। দ্বিতীয় কাজ ফজরের সালাত। তারপর যিকির ও অন্য ইবাদত। তারপর ‘কাজকর্ম ও রুজিরুটির’ চিন্তা।

এটা যে শুধু নবীজির সুন্নাত তাই নয়, আল্লাহর অঘোষিত বিধানও বটে। তিনি দিনকে আলোকিত করে দিয়েছেন, কাজ করার সুবিধার্থে। রাতকে আঁধার করে দিয়েছেন, প্রশান্তিময় ঘুমের সুবিধার্থে:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (১০) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

আমি রাতকে বানিয়েছি আবরণ, আর দিনকে বানিয়েছি জীবিকার ক্ষেত্র (নাবা: ১০-১১)।

নবীজি আমাদেরকে সকালে ওঠার প্রতি তাকিদও দিয়ে গেছেন:

للَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের সকালের মাঝে বরকত দান করুন (তিরমিযী)। নবীজি সকালের সময়ে বরকত দানের দু‘আ করে গেছেন। তার দু‘আ অবশ্যই কবুল হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত সত্য, অতি ভোরে কোনও কাজ শুরু করলে, দেখা যায় নয়টার আগেই কাজটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এটা নববী দু‘আরই ফসল। নবীজি কোনও অভিযান প্রেরণ করলে, ভোরেই পাঠাতেন।

উপরোক্ত হাদীসের রাবীর নাম হলো ‘সাখার গামেদী’ রা.। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তার অভ্যেস ছিল সকাল সকাল ব্যবসা শুরু করা। আল্লাহ তার ব্যবসায় অনেক বরকত দান করেছিলেন।

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ

তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসা শুরু করতেন ভোরে ভোরে। ফলে তিনি প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছিলেন, তার সহায়-সম্পদও অনেক বেড়ে গিয়েছিল (ইবনে মাজাহ-তিরমিযী)।

= আর একটু ভাবলেও বিষয়টা ধরা পড়ে, ভোরে ভোরে জেগে যাওয়া স্বাভাবিক বিষয়। প্রাকৃতিক। অন্যান্য জীবজন্তুও ভোরে জেগে যায়। শুধু মানুষ উঠতে দেরী করে! আমরা একটু চেষ্টা করলেই ‘সুন্নাতে’ অভ্যস্ত হতে পারি। আল্লাহ ও তার নবীর আদর্শকে ধারন করতে পারি।

সালাতুত-তাওবা!

আমরা কেউই গুনাহ করার অবকাশমুক্ত নয়! আমরা যারা সাধারণ মানুষ, তাদের সবারই শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুনাহ হয়ে যায়! কিন্তু তাওবা করা হয়ে ওঠে না আমাদের অনেকেরই!

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

সমস্ত আদমসন্তানই ভুল করে থাকে, আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম হলো যারা তাওবা করে ফেলে! (তিরমিযী)।

তাওবাকারীদের মধ্যে স্তরভেদ আছে। সত্যি সত্যি তাওবাকারী আর নামকাওয়াস্তে তাওবাকারী। প্রথম দলের তাওবার কারণে তাদের গুনাহ-খাতা ধুয়েমুছে সাফ-সুতরো হয়ে যায়! তারা একটা গুনাহ করার সাথে সাথেই তাওবা করে ফেলে। আবার কেউ কেউ আগে বেড়ে চমৎকার একটা সুন্নাতও আদায় করে। আমীরুল মুমিনীন আবু বকর রা. বলেছেন:

-আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি:

= কোনও ব্যক্তি যদি গুনাহ করে ফেলে, তারপর (অনুশোচনাদগ্ধ হয়ে) ভালভাবে ওজু করে দুই রাকাত ‘সালাত’ আদায় করে, তারপর ‘ইস্তেগফার’ করে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন! (তিরমিযী)।

ইস্তেগফার অর্থ: মাফ চাওয়া। ক্ষমা প্রার্থনা করা। নিজের ভাষায়, গুনাহের কথা বলে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়াকেই 'ইস্তেগফার' বলা হয়। এছাড়া নবীজি পড়তেন এমন কিছু আবরী দু'আও আছে। সেগুলোও পড়া যেতে পারে।

নবীজি হাদীসটা বলার পর নবীজি সা. আয়াতটাও তিলাওয়াত করেছিলেন:
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
এরা কোনও অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজের প্রতি যুলুম করে ফেললে, সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে ও তাদের কৃত পাপের জন্যে ক্ষমা চায় (আলে ইমরান:১৩৫)।

একবার পড়েই দেখতে পারি! দুই রাকাতই তো! গুনাহ মাফের এত সহজ রাস্তা আর হতে পারে? আজকেই হয়ে যাক না একদফা! সম্ভব হলে প্রতিদিন?

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৪৭

চেটেপুটে সুন্নাত!

আমাদের প্রিয় নবীজির সবকিছুই সুন্দর! তিনি নিজে সুন্দর! তার কথা সুন্দর! তার কাজ সুন্দর! তার মন সুন্দর! নবীজি সা.-এর খাওয়াও সুন্দর! কী নিপুণভাবেই না তিনি খাবার গ্রহণ করতেন।

আধুনিক মানুষেরা যেটাকে রুচিবোধ বলে বা শৈল্পিক ব্যঞ্জনা বলে, ঠিক সেটাই আমাদের ধর্মীয় ঘরানায় 'সুন্নাত' হিশেবে পরিগনিত। আবার তাদের শিল্প-রুচি আর আমাদের 'সুন্নাত' এক নয়। দুয়ের ধরন ও প্রকরণে বহুত ফারাক!

নবীজীবনের প্রতিটি পলেই আমাদের জন্যে শিক্ষা! আমাদের জন্যে আদর্শ।
আজ আমরা পুরো খাবার নয়, শুধু খাবার শেষ করার নববী ভঙ্গিটার সাথে পরিচিত হবো! পেয়ারা নবী হাত দিয়ে খাবার খেতেন। খাবারশেষে ‘আঙুল’ চেটে খেতেন। তিনি বলেও গেছেন:
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا"، أَوْ "يُلْعِقَهَا
তোমরা যখন খাবার গ্রহন করবে, চেটে খাওয়ার আগে হাত ধোবে না! অথবা অন্যকে হাতটা চেটে খেতে দিবে! (মুসলিম)।

অন্যকে চেটে খেতে দেয়ার বিষয়টা শুনে কারো মনে আপত্তি উঠতে পারে, ব্যাপারটা বাচ্চাদের হাত চেটে খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি! স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি! যাদের সাথে হৃদ্যতা গভীর! যাদের সাথে আপন রুচির গভীর মিল আছে, তাদের ক্ষেত্রে! মূল বিষয় হলো ‘খাবারশেষে’ নিজের আঙুল চেটে খাওয়া!

কেন চেটে খাবো? নবীজিই উত্তর দিয়েছেন:
وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
আঙুল চেটে না খেয়ে, হাত রুমালে মুছবে না। কারণ জানা নেই খাবারের কোন অংশটাতে ‘বারাকাহ’ আছে! (মুসলিম)।
পেয়ারা নবী এও বলে গেছেন:
فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ
কারণ খাবারের শেষাংশেই ‘বারাকাহ’ আছে! (নাসায়ী)।

এজন্যই নিয়ম হলো প্লেটে অল্প অল্প খাবার নেয়া। ওগুলো শেষ করে আবার নেয়া। তীব্র ক্ষুধার কারণে একসাথে প্লেটভর্তি করে ভাত নিলাম, পরে কোনও কারণে খাবারটা মুখে না রুচলে ফেলে দিতে হয়। এটা অপচয়! বুদ্ধিমানের কাজ হলো, শুরুতে সতর্ক থাকা! ভাল লাগলে আস্তে আস্তে পরিমাণ বাড়ানো! এ-নিয়মে ভাত বা খাবার নিলে, নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে না। সর্বোপরি খাবারশেষের বরকত লাভেরও সৌভাগ্য নসীব হবে!

পরহিত!

আমরা বর্তমানে ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি। পাশের বাসা তো দূরের কথা, ঘরের মানুষের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়ে ওঠে না। বিপদাপদে পাশে দাঁড়ানো তো অলীক কল্পনা, বাধ্য হয়ে পড়লে কোনও রকমে মোবাইলে সামান্য কথা বলেই দায় সারি!

নবীজির আদর্শ বা সুন্নাত কিন্তু এমনটা নয়। তিনি বিপদগ্রস্ত মানুষ দেখলে, সাথে সাথে তার সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি বলতেন:
المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ
= এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। একে অন্যের প্রতি যুলুম করবে না, বিপদের হাতে ছেড়ে দিবে না। নিজ ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ালে, আল্লাহও তার পাশে দাঁড়াবেন (বুখারী-মুসলিম)।

অন্যকে সহযোগিতা করতে গেলে তো টাকা লাগে! একদম ভুল কথা! যার কাছে যা আছে, সেটা দিয়েই পাশে দাঁড়ানো যায়। টাকা থাকলে টাকা। পরামর্শের দরকার হলে পরামর্শ। এমনকি চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে থেকেও সহযোগিতা করা যায়। একটুখানি মিষ্টি কথা দিয়েও সহযোগিতা করা যায়। কাঁধে হাত দিয়ে একটু চাপ দিয়েও সহযোগিতা করা যায়। ইচ্ছা করলে, উপায় একটা না একটা বের হয়েই যায়।

অন্যের পাশে দাঁড়ানোর উপকার বলে শেষ করা যাবে না:
ক: আল্লাহ খুশি। নবীজি খুশি!
খ: বান্দা খুশি।
গ: দুনিয়াতে উপকার।
ঘ: আখেরাতে উপকার।

আমরা কমপক্ষে দু‘আ করেও আমার বিপদগ্রস্ত ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতে পারি। বলতে পারি:
-ভাই! তোমার এই বিপদে কিছু করতে তো পারছি না, তবে নিয়মিত দু‘আ করছি!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৪৯

সিজদায়ে শোকর!

সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সিজদায়ে শোকর দেয়া যাবে কি না, সেটা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে! তবে আনন্দজনক সংবাদ লাভ করার পর, সাফল্য লাভের পর, সংকট বা রোগমুক্তির পর, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার সিজদায়ে শোকর দেয়া যে সুন্নাত, সেটা আমাদের মনে থাকে না।
وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
তোমাদের কাছে যে নেয়ামত আসে, সেটা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে (নাহল: ৫৩)।

আল্লাহ নেয়ামত দান করেন। বান্দা নেয়ামত গ্রহণ করার পর কী করবে? আল্লাহকে কি পাল্টা আরেকটা নেয়ামত দিবে? নাউযুবিল্লাহ! পাশের বাড়ি থেকে একবাটি কাঁঠাল পাঠিয়েছে! এখন বাটিটা কি খালি খালি ফেরত দেয়া যায়? কিছু একটা দেয়া লাগে না?
আল্লাহ আমাকে নেয়ামত দিয়েছেন, আমি কিভাবে খালি হাতে নেয়ামতটা গ্রহণ করি? আবু বাকরাহ রা. বলেছেন:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ
নবীজি সা.-এর কাছে যখনই কোনও আনন্দের সংবাদ আসতো অথবা তাকে কোনও সুসংবাদ দেয়া হতো, তিনি সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন! (আবু দাউদ)।

বান্দার বাটি ফেরত দিতে টাকা খরচ করতে হয়, কিন্তু আল্লাহর রহমতের বাটি ফেরত দেয়াই লাগে না। শুধু একটা সিজদা ব্যস! আর হাঁ. সিজদায় কী পড়বো?

-সাধারণ সিজদায় যা পড়ি? সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা! অথবা আলহামদুলিল্লাহ। অথবা আল্লাহুম্মাগফিরলী!

আল্লাহকে খুশি করা এত সহজ? শুধু একটা সিজদাতেই তিনি খুশি হবেন! তো আর দেরী কেন? প্রিয় রবের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই শুধু এই সিজদা দেয়া সম্ভব! মহব্বতবিহীন কাঠখোট্টাদের জন্যে এই সিজদা নয়! তো হয়ে যাক না একটা পরীক্ষা:

-আমি হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর প্রিয়) হতে রাজি কি না!

তা ছাড়া ওজুও করতে হয় না! থাকলে ভাল, না হলে ওজু ছাড়াই কাজ হয়ে যাবে! আর সহজ করা সম্ভব?

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৫০

নিত্যদিনের তাসবীহ!

আচ্ছা নবীজি সা.-এর সুন্নাত কি কঠিন হতে পারে? উঁহু মোটেও না। নবীজির সুন্নাত তো:

ক: আসহাল: সহজতর।

খ: আজমাল: সুন্দরতর।

গ: আকমাল: পূর্ণতর।

অনেক সময় এমন হয়, আমরা যখন শুনি:

-ওমুক দু'আটা একশবার পড়লে এই সওয়াব মিলবে, ওই ফযীলত লাভ করা যাবে! মর্যাদার বুলুন্দি হবে! গুনাহ মাফ হবে! তখন আমাদের মনে প্রথমেই চিন্তা আসে:

-ওরে বাপস্! এ ক শও বাআর!!! এত সময় কোথায় পাবো? এতক্ষণ কে বসে থাকবে?

আমাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। ‘একশ’ শুনতেই যা একটু বেশি লাগে, বাস্তবে ততটা নয়। আমরা আমলে না নেমেই অহেতুক-অমূলক ভয়ে কেঁপে উঠি! কার্যকালে দেখা যায় শুধু শুধু ভয় পেয়েছি!

গুনাহ করতে করতে করতে চারদিক ভরিয়ে ফেলেছি? কোনও ভয় নেই! নবীজি সমাধান দিয়ে গেছেন। খুবই সহজ! সময়ও ব্যয় হবে সাকুল্যে আড়াই মিনিটের মতো!
مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ
যে ব্যক্তি দিনে একশ বার ‘সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ পড়বে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। সমুদ্রের ফেনাপরিমাণ হলেও মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী)।

এর চেয়ে সহজ আর কী হতে পারে? অল্পপুঁজিতে কতো বেশি লাভ! হাদীসের ভাষ্যমতে দেখা যাচ্ছে, গুনাহের চেয়ে দু‘আটার ‘ক্ষমাশক্তি’ কত্তো বেশি! গুনাহ যতই করি, অনেকেই সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ তো আর করে না!

হাদীসটার আরেকটি রূপ দেখি:
مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ
যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একশবার করে ‘সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ পড়বে, কেয়ামতের দিন কেউ তার চেয়ে বেশি উত্তম কিছু নিয়ে আসতে পারবে না। শুধু আরেকজনও যদি দু‘আটা পড়ে, একমাত্র সেই তার সমকক্ষ হতে পারবে (মুসলিম)।

কেয়ামতের দিন শ্রেষ্ঠতম বস্তু সাথে করে নিয়ে আসা যাবে, শুধু ছোট্ট একটা দু‘আ নিয়মিত পড়লে! কোনও বুঝদার মানুষ এতবড় লাভ হাতছাড়া করতে চাইবে?

দুষ্টমনে প্রশ্ন জাগবে:

-আচ্ছা এই একটা আমল করলেই যদি সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তাহলে এত কষ্ট করে নামায-কালামের কী দরকার?

= জ্বি ভায়া! নামায-কালামের দরকার আছে! একটা বিষয় কি খেয়াল করেছেন? আপনি সকাল-সন্ধ্যায় দু'আটা পড়লে, গুনাহ মাফ হয়ে যাবে! পাশাপাশি এটাও মনে রাখবেন, আপনি দু'আটা নিয়মিত পড়লে, নামায না পড়ে থাকতেই পারবেন না! উল্টো করে বলতে গেলে, আপনি নামায-কালাম না পড়লে, এই দু'আ পড়ার তাওফীকই লাভ করবেন না! পরীক্ষা করে দেখতে পারেন! দু-একদিন চলার পর কিভাবে যেন আমলটা বন্ধ হয়ে গেছে!

আর হাঁ, সগীরা গুনাহ মাফ হবে। কবীরা গুনাহ মাফের জন্যে তাওবার প্রয়োজন হবে!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৫১

মৃত্যুকামনা!

আমাদের জীবনে সুবিধা-অসুবিধা থাকেই। বিপদাপদে সবর করে থাকাই ঈমানের দাবি। কিন্তু কেউ কেউ বিপদে পড়লে হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। নিস্তার পাওয়ার জন্যে মৃত্যুকামনা করে বসে। মনে করে, মরে গেলেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। মনে মনে না চাইলেও, মুখে মুখে হলেও মওত কামনা করে। এটা এক ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তি।

لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ

তোমরা মৃত্যু কামনা করবে না। নেককার মানুষ হলে, সে বেঁচে থাকলে আরও বেশি নেককাজ করতে পারবে। বদকার হলে, পরে বদকাজ থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না (বুখারী)।

অন্য হাদীসে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে বলা হয়েছে। মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়নি। বিশেষ করে বিপদে পড়লে। বেঁচে থাকলে একসময় বিপদ কেটে যাবে। সুদিন ফিরবে। আরও ভাল ভাল কাজ করা যাবে। আগে ভাল কাজ কম করা হয়ে থাকলে, ভবিষ্যতে তাওবার সুযোগ মিলতে পারে। আর মৃত্যু আল্লাহর আওতায়। সেটা নিয়ে বান্দার ব্যতিব্যস্ত হওয়া কাম্য নয়।

তারপরও মাঝেমধ্যে কিছু সময় আসে, টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বাঁচামরা সমান হয়ে যায়। বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াকেই বেশি সহজ মনে হয়। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে? নবীজি সা.-এর সমাধান দিয়ে গেছেন:
لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي
তোমরা বিপদে পড়লে, মৃত্যু কামনা করবে না। যদি একান্তই এমন কিছু করতে হয়, তাহলে বেশির চেয়ে বেশি এটুকু বলতে পারো: হে আল্লাহ! যতদিন আমার বেঁচে থাকাটা কল্যাণকর, ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন! আর যদি মুত্যই আমার জন্যে কল্যাণবহ হয়, তবে মৃত্যুই দিয়ে দিন (মুত্তাফাক)।

সাথে সাথে এটাও মনে রাখতে হবে: মৃত্যু কামনা করা কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা নয়। মৃত্যুকামনা না করাই স্বাভাবিক প্রবণতা। মনকে এভাবেই গড়ে তুলতে হবে। বিপদ এলে আল্লাহর দিকে মনকে ফেরাতে হবে। সাহায্য চাইতে হবে! সবর করার তাওফীক কামনা করতে হবে!

সালাতুল ইস্তিখারা!

ইস্তিখারা মানে ‘কল্যাণ চাওয়া’। সব সময়, সব বিষয়ে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়? মানুষ তো গায়েব জানে না। আগামী কাল কী হবে, সেটাও তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এমনকি নবিজী সা.-ও গায়েব জানতেন না। আল্লাহ তা‘আলা তাকে গাইবের সংবাদ জানালে, তখন জানতে পারতেন। এই জানার ওপর ভিত্তি করেই প্রিয় নবীজি সা. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এবং সেটা শতভাগ সঠিক সিদ্ধান্তই হতো।

জটিল ও সঙ্গীন মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু কোনদিকে পা ওঠাব, ঠিক করে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ে। পেরেশানি আর হয়রানির অন্ত থাকে না। মাঝে মধ্যে এমনও হয়: সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে, ভাল করে যাচাই-বাছাই করার পর বের হয়: কাজটাতে ভালমন্দ উভয় দিকই সমান সমান! এখন কী করবো?

এ-ধরনের সমস্যার সমাধান পেয়ারা নবী দিয়ে গেছেন। খুবই সহজ একটা সমাধান। চমৎকার একটা সুন্নাত:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي"

জাবের রা. বলেছেন: নবীজি সা. আমাদেরকে সমস্ত বিষয়ে ‘ইস্তিখারাহ’ শিক্ষা দিতেন। আমাদেরকে কুরআন কারীমের সূরা যেমন গুরুত্ব দিয়ে শেখাতেন, ইস্তিখারাও হুবহু একই গুরুত্ব দিয়ে শেখাতেন। নবীজি বলতেন:
= তোমরা কোনও বিষয়ে উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হয়ে পড়লে, দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিবে। তারপর ইস্তিখারার দু‘আ পড়বে (বুখারী)।
= আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে কল্যান কামনা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে ‘শক্তি’ কামনা করছি। আপনার মহা অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কারণ আপনিই ক্ষমতাবান, আমার কোনও ক্ষমতা নেই। আপনি সব জানেন, আমি জানি না। আপনি গাইবের মহাজ্ঞানী।
ইয়া আল্লাহ! আপনার ইলমে (জানায়) যদি উক্ত বিষয়টা আমার দ্বীন-দুনিয়া-জীবিকা-পরিণতির জন্যে কল্যাণকর হয়, তাহলে সেটা আমার জন্যে নির্ধারণ করে দিন। সহজ করে দিন। তাতে বরকত দান করুন। আর যদি বিষয়টা আমার জন্যে সার্বিকভাবে অকল্যাণকর হয়, বিষয়টা আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন। আমাকেও বিষয়টা থেকে সরিয়ে নিন। আমি যে অবস্থাতেই থাকি, আমার জন্যে কল্যাণের ফয়সালা করুন। আমাকে খুশি করে দিন।

মনে হতে পারে, বড় কোনও বিপদ বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ হলে, ইস্তিখারার নামায পড়তে হবে। এই চিন্তা সঠিক নয়। পাশাপাশি ইস্তিখারার পর, ঘুমের মধ্যে কোনও ইঙ্গিতপূর্ণ স্বপ্ন দেখাও জরুরী নয়।

হাদীসের ভাষ্যমতে, ইস্তিখারাকারী নামায আদায় করে, দু‘আটা পড়ে, কাজে নেমে পড়বে। যদি দেখে কাজটা সহজেই করা যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আর পরিস্থিতি ভিন্ন হলে, নানা প্রতিবন্ধকতা আসতে থাকলে, ক্ষান্ত দিবে।
দু‘আটা সালামের আগে নামাযের মধ্যেও পড়া যাবে। সালাম ফেরানোর পরও পড়া যাবে। এমনকি নামায পড়া ছাড়া, শুধু দু‘আটা পড়েও কাজ শুরু করা যাবে। মহিলাদের বিশেষ সময়ে নামায পড়া অসম্ভব, অথবা সফরের হালতে বা নামায পড়া যায় না, এমন হালতে থাকলে পুরুষও শুধু দু‘আ পড়ে কাজ শুরু করতে পারবে।

সুন্নাত তরীকায় ইস্তিখারা করার ভাবনাই তো কেমন শিহরন জাগানো। ভাবতেই কেমন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে:
-আমি এখন যা করতে যাচ্ছি, সরাসরি আল্লাহ সাহায্যকারী হিশেবে আছেন। সঠিক সিদ্ধান্তটা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসছে। আর এত সহজ একটা 'আমল' খোদ নবীজি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন! আর কিছু লাগে?

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৫৩

যৌথ-রসনা!

ইসলাম সব সময় ঐক্যের ওপর জোর দেয়। বিভেদ-অনৈক্য পছন্দ করে না। কিভাবে ঐক্য ধরে রাখা যায়, তার মূলসূত্রগুলো বলে দেয়। নবীজি সা.-ও পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। সামাজিক ও পারিবারিক উভয় অঙ্গনে। এজন্য খুব বেশি কিছু যে করতে হয়, এমন কিন্তু নয়। ইসলামের এটাই বড় একটা বৈশিষ্ট্য, অতি সহজ ও সরল একটা কাজ, অথচ ফলাফল অকল্পনীয়। সামান্য মেহনতে, ছোট্ট একটু হরকতেই বিরাট বরকত হাসিল হয়ে যায়।

বর্তমানে আমাদের ঘরে বরকত নেই। রিযিকে বরকত নেই। খাবারে বরকত নেই। রুজিতে বরকত নেই। রোজগারে বরকত নেই। সময়ে বরকত নেই। এ নিয়ে হাহুতাশেরও অন্ত নেই।

নবীজি সহজ একটা সমাধান দিয়ে গেছেন। সাহাবীরা পেয়ারা নবীর কাছে অনুযোগের স্বরে বললেন:
يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ. قَالَ: "فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟" قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ

-আমরা খানা খাই, কিন্তু পেট ভরে না। তৃপ্ত হতে পারি না।

-সম্ভবত তোমরা আলাদা আলাদা খাও?

-জ্বি জ্বি ঠিক তাই!

-একসাথে খেতে বসবে। আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করবে। আল্লাহ বরকত দিবেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

মাত্র দুইটা কাজ করতে বলেছেন নবীজি। তাতেই বরকত দেখা দিবে:

ক: একসাথে মানে একপ্লেটে খেতে বসা।

খ: শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া।

এখানে বরকত বলে শুধু খাবারের বরকত ও শরীরে তার প্রভাবের কথাই নবীজি বলেননি, পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা দিবে। একসাথে নিয়মিত খেতে বসলে, পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি, রেষারেষি হওয়া সম্ভব? সবাই সবার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকলে বরকত না এসে পারে?

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৫৪

জুমার অবগাহন!

জুমার দিন গোসল করার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রচলিত ধর্মমতগুলোর মধ্যে, ইসলামই শারীরিক সূচিতার প্রতি সবিশেষ জোর দেয়। নানাভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাকিদ দেয়। আর জুমাবারে পরিচ্ছন্ন থাকার গুরুত্ব আরও বেশি করে দেয়। নবীজি বলেছেন:

الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব (আবশ্যক)। বুখারী-মুসলিম।

হাদীসে ওয়াজিব বলে, গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। না গুনাহ হবে এমন নয়। কিন্তু নবীজি প্রতি জুমাবারেই গোসল করেছেন। সামাজিকভাবেও গোসলের গুরুত্ব বোঝা যায়। এদিন মসজিদে অন্যদিনের তুলনায় মানুষ বেশি হয়। অপরিচ্ছন্ন পোষাক আর অগোসল শরীরে মসজিদে গেলে, পাশে বসা ভাইদের কষ্ট হতে পারে। তার নামায-ইবাদতে বিঘœ সৃষ্টি হতে পারে।

আর গোসল করলে অনেক সওয়বের ভাগীদারও হওয়া যায়:
مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا
জুমার দিন যে ব্যক্তি ভালভাবে গোসল করলো, তারপর তাড়াতাড়ি মসজিদে গেলো, কোনও বাহনে না চড়ে হেঁটে মসজিদে গেল, ইমামের কাছাকাছি গিয়ে মনোযোগ দিয়ে কথা-খুতবা শুনলো, অনর্থক কোনও কথা বললো না: সে প্রতিটি কদমের জন্যে, এক বছর নামায-রোযার সওয়াব পাবে।

এক অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি। এত সহজ একটা আমলে এতবড় অর্জন! আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর যা করুন অবস্থা! তার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করা যায় না। শুধু দয়ার আশা করতে পারি। কিন্তু এই আমলের মাধ্যমে পুরো একবছ আমল করার সওয়াব পেয়ে যাবো! তাও প্রতিটি কদমে! (আবু দাউদ)।

মসজিদে বেশি দূরে হলে, হাঁটার বদলে গাড়িতে গেলেও আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের অপারগত বুঝবেন। এবং বিনিময়ের ব্যাপারেও বিবেচনা করবেন। ইনশাআল্লাহ!

ওসিয়তনামা!

পেয়ারা নবী সা. চাইতেন, তার উম্মত সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করুক। পরকালের কথা স্মরণে রাখুক। তাহলে তার আমলের উন্নতি হবে। আখেরাতের প্রস্তুতিও ভাল হবে। গুনাহমুক্ত জীবন গঠনে সহায়ক হবে। বান্দা তাওবামুখী হবে। নিজের আমল সংশোধনে ব্রতী হবে। অন্যের হক যথাযথ আদায়ে তৎপর হবে। অন্যের হক আত্মসাৎ করতে ভয় পাবে। তিনি বলে গেছেন:
أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ
তোমরা বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করো (তিরমিযী)।

মৃত্যুকে স্মরণ করার অন্যতম একটি প্রকাশ-মাধ্যম হলো: ওসীয়তনামা লিখে রাখা। বিশেষ করে তার ধন-সম্পদ থাকলে, ওসীয়ত করা জরুরী। ঋণ থাকরে তো কথাই নেই। আর যদি সে যৌথ-কারবারে থাকে, নিয়মিত লেনদেন, দেনা-পাওয়ার হিশেব নিকেশ পরিষ্কার করে রাখা জরুরী। ওয়ারিশদের জন্যে সুস্পষ্ট বাগ-বাঁটোয়ারা করে রাখা আবশ্যক। এতেকরে ‘হক’ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে। আমানতদারিতা রক্ষা পায়। নবীজি সা. বলে গেছেন:
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
কোনও মুসলমানের কাছে, ওসীয়ত করার মতো কিছু থাকলে, তাহলে তা লিখে না রেখে দু’রাত কাটানোও সমীচিন নয় (বুখারী)

ইবনে উমার রা. বলেছেন:
-আমি এই হাদীস শোনার পর, একরাতও ওসীয়ত না লিখে ঘুমুইনি। প্রতি রাতেই আমার সাথে ওসীয়তনামা ছিল।

অথচ আমাদের মধ্যে একটা ধারনা প্রবলভাবে বিদ্যমান: ওসীয়ন বুঝি মরণকালের ব্যাপার-স্যাপার! অথচ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সামান্য সম্পদ থাকলেই, নিয়মিত

ওসীয়ত লিখে রাখতে হবে। ছেলে হোক আর বুড়োই হোক! এটা আসলে মওতেরই প্রস্তুতি! আমি কখন চলে যাই, তার কোন ঠিক ঠিকানা আছে! সবকিছু গুছিয়ে রাখাই ভালো নয়কি? নবীজি আমাদেরকে এভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৫৬

বিপদাপদের দু‘আ!

একটার পর একটা বিপদ আসতেই থাকবে। এটাই দুনিয়াবী যিন্দেগীর নিয়ম। এক শোক কাটিয়ে না উঠতেই আরেক শোক এসে হাযির হবে। একটা বাধা অতিক্রম না করতেই আরেক বাধা এসে ধর্না দিবে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা সহজেই উতরে যায়, তাদের কাছে অনেক বড় বিপদকেও কিছু মনে হয় না। কিন্তু যাদের কোনও চালচুলো নেই, তাদের কাছে একেকটা বিপদ যে কতোটা কষ্ট নিয়ে হাযির হয়, বলে বোঝানো যাবে না। রাব্বে কারীম বলেছেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

নিশ্চয় আমি মানুষকে কষ্ট-পরিশ্রমের মাঝে রেখেই সৃষ্টি করেছি (বালাদ:৪)।

বান্দা দুনিয়াতে থাকতে হলে, নিরন্তর পরিশ্রম করেই যেতে হবে। এটা আল্লাহরই নির্ধারিত বিধান।

বিপদাপদ সামনে এলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। একবার এর কাছে যায়, আরেকবার ওর কাছে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে নবীজি সা. আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন: আল্লাহর অভিমুখী হতে। আল্লাহর দিকে সবকিছু ন্যস্ত করতে। সোপর্দ করতে। রুজু করতে। কারন তার হাতেই তো সব সমাধানের চাবিকাঠি:

قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

আপনি বলে দিন, আল্লাহই তোমাদেরকে রক্ষা করেন এই মুসীবত থেকে এবং অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট হতেও (আনআম: ৬৪)।

বিপদাপদ এলে নবীজি দু‘আটা নিয়মিত পড়তেন:
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ العَلِيمُ الحَلِيمُ،
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ،
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। তিনি সর্বজ্ঞ সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। তিনি মহান আরশের রব। আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই। তিনি আসমানের রব, যমীনের রব, সম্মানিত আরশের রব (বুখারী)।

উক্ত দু‘আর মাধ্যমে নবীজি সা. আমাদেরকে শিখিয়েছেন, আল্লাহ তা‘আলাই সবকিছুর নিয়ন্তা। রক্ষাকর্তা। তিনিই সবকিছুর অধিকর্তা। তার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটতে পারে না। তাই আমাদের উচিত আল্লাহভিমুখী হওয়া। সবকিছুর জন্যে আল্লাহর দিকেই ফিরে যাওয়া!
বিপদাপদের পরীক্ষা তার পক্ষ থেকেই আসে, সমাধানও তার পক্ষ থেকেই আসবে। অন্য কোথাও থেকে আসবে না। এই বিশ্বাসটুকু মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে নিতে পারলে, অস্থিরতা অনেকাংশেই কেটে যাবে!

লা ইলাহ ইল্লাল্লাহুল আলীমুল হালীম।
লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম।
লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু রাব্বুস-সামা-ওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি, রাব্বুল আরশিল কারীম।

মধু চিকিৎসা!

অসুস্থ হলে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করা সুন্নত। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুন্নত। বিপদ এলে আল্লাহর আশ্রয় নেয়া, দু'আ করাও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। নবীজি বলেছেন:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

সব রোগেরই ওষুধ আছে। যখন রোগের ওষুধ গ্রহণ করা হবে, আল্লাহর অনুগ্রহে বান্দা আরোগ্য লাভ করবে (মুসলিম)।

হাদীশ শরীফে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার কথা আলোচিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে মধুর চিকিৎসা। বিশেষ করে উদর-সম্পর্কিত রোগের ক্ষেত্রে।

একলোক এসে নবীজি সা.-এর কাছে এসে বললো:

-আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ!

-তাকে মধু পান করাও!

লোকটা আবার এসে বললো:

-আমার ভাইয়ের পেটের অসুখ!

-তাকে মধু পান করাও!

এভাবে তৃতীয়বার এলো। একই সমস্যার কথা বললো। নবীজিও একই উত্তর দিলেন। লোকটা বললো: পান করিয়েছি। তখন নবীজি বললেন:

صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً

আল্লাহ সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের উদর মিথ্যা বলেছে! তাকে মধু পান করাও (বুখারী)!

তাকে আবার পান করানো হলো। লোকটার ভাই নিরাময় লাভ করলো।

অসুস্থ লোকটা প্রথম প্রথম মধুকে অতটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেনি। পরিপূর্ণ আস্থা নিয়েও পান করেনি, তাই কাঙ্খিত ফলোদয় হয় নি। পরে নবীজির দৃঢ় বক্তব্যের কারণে তার মধ্যে আস্থা তৈরী হয়েছে। শতভাগ নির্ভরতা নিয়েই মধু পান করেছে, সাথে সাথে আল্লাহর ইচ্ছায় শেফা লাভ করেছে।

শুধু হাদীসে নয়, কুরআন কারীমেও মধুর কথা গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে:
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ
মৌমাছির উদর থেকে পানীয় (মধু) নির্গত হয়, বিভিন্ন রঙের। তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে শিফা (নাহল: ৬৯)।

আমরা নিয়মিত মধু পান করতে পারি। অসুখ হলে প্রথমেই সুন্নাতের নিয়তে, নিরাময় লাভের আশায় মধু পান করতে পারি। পাশাপাশি না হয় ডাক্তারি চিকিৎসাও চলতে থাকলো। শেফাও হবে আবার সুন্নাত পালনের কারনে সওয়াবও হবে।

হাতের কাছে মধুর একটা শিশি রাখতে পারি। ঘরের তাকে যত্নের সাথে মধুর একটা শিশি পুষতে পারি। সুন্নত পালনের নিয়তেই! সওয়াব হবে। সওয়াবের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৫৮

নিশ্চিত সুরক্ষা!

রাতের আঁধারে নানা বিপদাপদ লুকিয়ে থাকে। ওঁৎ পেতে থাকে অজানিত ভয়। দুষ্টলোকের ভয়, দুষ্ট জ্বিনের ভয়, ক্ষতিকর সরিসৃপের ভয়, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়। এসব আচানক বিপদ থেকে রক্ষার উপায়?

পেয়ারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এর চমৎকার সমাধান দিয়ে গেছেন। উম্মতকে এসব আচম্বিত আপদ থেকে বাঁচাতে ফর্মুলা বাতলে দিয়েছেন।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণই হলো অব্যর্থ ‘পথ্য’। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, একমাত্র তিনিই পারেন তার সৃষ্টিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। এক লোক এসে নবীজিকে বললো:
-গতরাতে আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছে!
-তুমি যদি সন্ধ্যায় দু‘আটা পড়ে নিতে, তাহলে বিচ্ছুর দংশন তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারতো না!
-কোন দু‘আ?
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ ‘কালিমাসমূহ (বাক্য)-এর মাধ্যমে সৃষ্টিজীবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি (মুসলিম)।

যে ব্যক্তি প্রতি সন্ধ্যায় দু‘আটা তিনবার পড়ে নিবে, রাতের বেলা বিচ্ছুর বিষ তার শরীরে কোনও ক্রিয়া করতে পারবে না (তিরমিযী)।
আবু হুরায়রা রা. নিয়মিত দু‘আখানা পড়তেন। আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমা কী?
= কুরআন কারীম।

দু‘আটা সন্ধ্যাবেলাতেই পড়তে হয়। তবে অপরিচিত কোথাও গেলে, নতুন ঘরে উঠলে, উন্মুক্ত-অরক্ষিত স্থানে অবস্থানকালে, বনে-বাদাড়ে যেতে হলে, দু‘আখানা পড়ে নেয়া ভাল:
-তোমরা কোনও ঘরে গেলে, দু‘আখানা পড়ে নিবে। তাহলে উক্ত স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোনও অনিষ্টকর কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না (মুসলিম)।

সুহাইল বিন আবি সালেহ রহ, বলেন:
-আমাদের পরিবারের লোকেরা প্রতি রাতে দু'আটা পড়ে নিত। একরাতে হলো কি, আমাদের এক মেয়েকে বিচ্ছু দংশন করলো, কিন্তু সে কোনও ব্যথা অনুভব করলো না (তিরমিযী)।

যাদের কর্মস্থল থেকে ফিরতে রাত হয়ে যায়, অন্ধকার পথ দিয়ে নীড়ে ফিরতে হয়, তাদের জন্যে এই দু'আ। যারা দূরপাল্লার যাত্রী, গন্তব্যে নামতে নামতে রাত গভীর হয়ে গেছে, এখন গ্রামের গা-ছমছমে পথ দিয়ে একাকী ঘরে ফিরতে হবে, পথে আছে কবরস্থান, বটগাছ, শ্মশান ইত্যাদি! তাদের করণীয় কি? সেটা বলার অপেক্ষা রাখে?
হাম্মাম (বাথরুম) অনেক দূরে, নির্জন রাতে ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, সাহরী খেতে উঠে একাকী রান্নাঘরে যেতে হলেও কিন্তুক......! অতশত না ভেবে, প্রতি স্বর্ণালি সন্ধ্যায়, দু'আখানা পড়ার অভ্যেস করে নিলেই হলো! নিয়মিত কিছুদিন পড়লে, ভেতরে 'অটো-পাইলট মুড' তৈরী হয়ে যাবে। অর্থাত অজান্তেই প্রতি গোধূলিলগ্নে দু'আ স্বতোৎসারিত হবে!
তবে দৈনন্দিন জীবেনর দু'আগুলোকে 'অটো-পাইলট মুডে না পড়ে, অর্থের দিকে খেয়াল করে পড়লে, প্রভাবটা বেশি ক্রীয়াশীল হওয়ার সম্ভাবনা! কারণ আমি কী দু'আ করছি, সেটা যদি আমার জানা থাকে, আত্মবিশ্বাসের 'পারদ'টা বেড়ে যাবে না!

(হাদীসগুলোর ভাবটা নেয়া হয়েছে, তরজমা নয়)

আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা- খলাকা!

চাঁদমামার দু‘আ!

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই আল্লাহর ইবাদত করে। যে যার মতো করে। এটা আল্লাহ তা‘আলাই বলেছেন:
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
সবকিছুই তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না (ইসরা ৪৪)।

নবীজি বিষয়টা ভালোভাবেই জানতেন। এজন্য দেখা গেছে, তিনি অনেক জড়পদার্থের সাথেও ‘জীবের’ মতো আচরণ করেছেন। ওহুদ পাহাড় সম্পর্কে বলেছেন:
-ওহুদ আমাদেরকে ভালোবাসে আমরাও তাকে ভালোবাসি!

নতুন চাঁদকেও নবীজি বেশ গুরুত্ব দিতেন। চাঁদ দেখে চমৎকার একটা দু‘আ পড়তেন:
اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ
ইয়া আল্লাহ! আপনি চাঁদটাকে আমাদের জন্যে সৌভাগ্য ও বিশ্বাস, নিরাপত্তা ও আত্মসমর্পণের ‘সুযোগ’ করে উদিত করুন! আমার ও তোমার প্রতিপালক ‘আল্লাহ’! (তিরমিযী)

এই দু‘আটা পেয়ারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা বছরে সর্বমোট বারোবার পড়তেন। তিনি প্রতিটি মাসকে শুরু করতেন সৌভাগ্য বরকত কামনার মধ্য দিয়ে। দ্বীনের ওপর অটল থাকার তাওফীক কামনার মধ্য দিয়ে।
নবীজি এই দু‘আ পাঠের মাধ্যমে বোঝা যায়, তিনি প্রতি মাসে নতুন চাঁদকে বেশ গুরুত্বে সাথে দেখতেন। চাঁদ দেখা সুন্নাত। প্রতি আরবী মাসে চাঁদ দেখা একটা ইবাদত!

চাঁদ দেখা একটা স্বতন্ত্র ইবাদত হওয়ার পাশাপাশি, ইসলামের অনেক ইবাদতও চাঁদের উদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আশুরার রোজা। রামাদানের রোজা! জিলহজের রোজা। এমনকি প্রতি মাসের আইয়ামে বীয মানে ১৩-১৪-১৫ তারিখের রোজা রাখার জন্যে আরবী তারিখ জানা প্রয়োজন।

সর্বোপরি দু'আটার অর্থটাও বেশ সুখকর! দুনিয়া-আখেরাত উভয়টাই বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। সুখ-শান্তি কামনা করা হয়েছে। আর দু'আপাঠের মাধ্যমে নবীজির 'সুন্নাতের ওপর আমল করার বিষয়টা তো আছেই!

আল্লাহুম্মা! আহিল্লাহু আলাইনা বিল-ইউমনি ওয়াল ঈমা-ন, ওয়াস-সালা-মাতি ওয়াল-ইসলাম। রাব্বী ওয়া রাব্বুকা 'আল্লাহ'!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৬০

সুন্নতী পাদুকা!

সুন্নতী পাদুকা আবার কেমন? যে পাদুকা মানে জুতো সুন্নত তরীকায় পরা হয়, সেটাই সুন্নতী পাদুকা! ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের মূল পার্থক্য হলো: অন্যধর্মগুলো মতবাদনির্ভর ধর্ম আর ইসলাম মতবাদের পাশাপাশি কর্মনির্ভর ধর্ম। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পথ চলার পাথেয় যোগায়।
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও ইসলাম সুনির্দিষ্ট নিদান দিয়েছে। জুতো পরা থেকে শুরু করে টুপি পরা পর্যন্ত প্রতিটি কাজের একটা মানদন্ড দিয়েছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই আমাদের জন্যে আদর্শ রেখে গেছেন। আয়েশা রা. নবীজি আচরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন:
يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّ

-তিনি ‘ডান’ পছন্দ করতেন। জুতোপরা, মাথায় সিঁথি কাটা থেকে শুরু করে পবিত্রতা অর্জন, অর্থাৎ প্রতিটি কাজেই তিনি ডানদিককে প্রাধান্য দিতেন (বুখারী)।

অল্পকিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, সবকাজেই নবীজি ডানদিককে আগে রাখতেন। সব ভালকাজই তিনি ‘ডান’ দিয়ে শুরু করতেন:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ
নবীজি যতোটা সম্ভব, ডানদিকনির্ভরতাকে পছন্দ করতেন। পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে, জুতো পরার ক্ষেত্রে, চুলে সিঁথি কাটার ক্ষেত্রে (নাসায়ী)।

নবীজি আরো বলেছেন:
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
তোমরা যখন জুতো পরতে যাবে, ডানদিক থেকে শুরু করবে। আর যখন জুতো খুলতে যাবে, বামদিক থেকে শুরু করবে। যাতে ডানদিকটা প্রথম পরা হয়, আর (খোলার সময়) ডানদিকটা পরে খোলা হয়।

এটা ছিলো জুতো পরা ও খোলার সুন্নত। পরার সময় ডান’পা আগে। খোলার সময় বাম’পা আগে। অতি সহজ একটা সুন্নত। একটু খেয়াল করলেই আমরা সারাদিনে কতোবার এই সুন্নাতটা আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি? হতে পারে, এই একটা সুন্নাতই আমার নাজাতের উসীলা হয়ে যেতে পারে। নবীজির শাফায়াত লাভের যরীয়াহ হয়ে যেতে পারে! জাহান্নাম থেকে বাঁচার শক্তিশালী একটা ‘আমলে’ পরিণত হতে পারে!

ইস্তেনসার!

সুন্নত তরীকায় জীবন যাপন করার কথা মনে হলে, একটা ভুল চিন্তা কখনো কখনো মাথায় উদয় হয়: যেসব হাদীসে ফিকহী মাসায়েলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো বোধ হয় সুন্নত নয়, সুন্নত হলো, তিন তাসবীহ, দু'আ-দুরূদ, যিকির-আযকার করা।

আমরা যেসব হাদীসকে আহকামের হাদীস মনে করি, সেগুলো সুন্নতের হাদীসও বটে। অর্থাৎ কারো কারো মনে হতে পারে, সুন্নত হলো কিছু আমলের নাম, আর বিধানগুলো হলো 'হাদীস'। বস্তুত বিধানটাও একটা সুন্নত। ওটা পালন করে আমি মূলত একটা সুন্নতই আদায় করলাম!

শয়তান ও মানুষের দ্বন্দ্ব সবসময়ের। এটা কেয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। শয়তান মানুষকে গোমরাহ করার শপথ করেই মাঠে নেমেছে:
لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً
আমি সামান্যসংখ্যক ছাড়া তার (আদমের) বংশধরদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেবো (ইসরা ৬২)।

মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান মানুষের অতি সন্নিকটে এসে পড়ে। তার যুদ্ধ পুরোদমে শুরু করে। নানা কৌশলে। কখনো নামাযের প্রতি উদাসীন করে, কখনো দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে! এজন্য নবীজি আমাদেরকে কিছু আমল শিখিয়ে গেছেন, আমরা যেন ঘুমের ঘোরেও শয়তানের 'কুকর্ম' থেকে রক্ষা পেতে পারি। এমন একটা সুন্নত হলো:
-ইস্তেনসার!
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ

তোমরা ঘুম থেকে জাগলে, তিনবার ইস্তেনসার করবে। কারন শয়তান নাসারন্ধ্রে রাতযাপন করে! (মুসলিম)

ইস্তেনসার: পানি ছিটানো! এখানে অর্থ হবে, নাক থেকে পানি ঝাড়া!
রাতে ঘুম ভেঙে গেলে, দুঃস্বপ্ন দেখলে, ঘুম না এলে, ইস্তেনসার করা। এটা সুন্নাত। যদি ঘুম ভেঙে যাওয়া বা ঘুম না আসাটা শয়তানের কুপ্রভাবের কারণে হয়, ইস্তেনসারের মাধ্যমে শয়তান দূর হবে। ঠিক একই কাজ ওজুর মধ্যেও করা হয়।

নাক থেকে পানি ঝাড়ার আগে তো নাকে পানি দিতে হবে! জ্বি, আগে নাকে পানি দিবে। এই পানি দেয়াকে বলা হয় ‘ইস্তেনশাক’: নাক দিয়ে পানি টানা! এই টেনে নেয়া পানিকে ঝেড়ে ফেলাকেই ‘ইস্তেনসার’ বলা হয়।

আমরা নুরানীতে ওজুর মাসয়ালা পড়ার সময় কোরাস করে বলি: নাকে পানি দেয়া! এটাই ইস্তেনশাক! তবে এখানে ছোট্ট একটা আপত্তি তোলা যেতে পারে: নাকে পানি দেয়া যদি বলি, তাহলে ইস্তেনশাকের অর্থটা ঠিক আদায় হয় না। এবং হাদীসের মূল চাহিদারও কাছাকাছি পৌঁছা যায় না। এখানে বলা দরকর:
-নাকে পানি টানা!
দেয়া আর টানার মধ্যে পার্থক্য কী?
-বিরাট পার্থক্য! নাকে পানি দিলে, নাসারন্ধ্রের গোড়া পর্যন্ত পানি যায় না! কিছু জায়গা পানি ছাড়া থেকে যায়! নাকও পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না।

আমরা যদি হাতের ‘কোষে’ পানি নিয়ে, আস্তে করে নাক ডুবিয়ে পানি টানি, তাহলে পানিটা একদম নাসারন্ধ্রের মূল পর্যন্ত পৌঁছে! ‘ইস্তেনশাক’ শব্দের ওপর পুরোপুরি আমল হয়। কারণ শব্দটার মধ্যেই ‘চাওয়া’ বা তলব বা টানার একটা ভাব আছে। প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা যদি, হাতের কোষে পানি নিয়ে, নাকে ছিদ্রে ঠেসে দিলাম, পানি ঢকুল কি ঢুকল না, এরপর আঙুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করলাম, এতে ইস্তেনশাক হয় না।

আমরা দরসে প্রশ্ন করেছিলাম:
-তাহলে হুযুর! এভাবে করতে গেলে তো পানি সুড়ুৎ করে মাথায় উঠে যাবে!
-আরে 'হোঙ্গুলের চা অগল'! তোরে এত জোরে 'হানি' টাইনবেল্লাই কইসে কনে? তুই টাইনবি আস্তে করি! তোরে কইসিনি তুই নাক দি হানির লগে কুস্তি খেল! বেশি বুঝস কিল্লাই! (মুসলিম শরীফের দরস থেকে)!
(রাব্বে কারীম তাঁকে (মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ রহ.) জান্নাত নসীব করুন)

তারমানে হাদীস অনুযায়ী প্রথমে হালকা চালে ইস্তেনশাক করতে হবে, পরে ইস্তেনসার করতে হবে। ইস্তেনশাক হবে ডানহাত দিয়ে। ইস্তেনসার হবে বামহাত দিয়ে। ইস্তেনসারে হাত লাগাতে হবে কেন? নাক দিয়ে ফুঃ দিলেই তো সব বেরিয়ে আসবে! তারপরও নাকে বামহাতের আঙুল দিয়ে নাকের ভেতরটা একটু সড়গড় করে দিতে হবে। এটাই সুন্নাত!

তাহলে হুযুর! মাঝরাতে উঠে এভাবে নাকে পানি দিয়ে, শয়তান তাড়াতে গেলে, শয়তানের সাথে সাথে ঘুমওতো পালিয়ে যাবে!
-আগে পরীক্ষা করে দেখ! ঘুম পালায় না থাকে! আর এটা তো সব সময় করতে হবে না! এই সুন্নতটা মূলত ঘুম থেকে ওঠার পর, তাহাজ্জুদ বা ফজরের ওজুর সময় করা হয়ে থাকে! মাঝরাত্তিরে তো খুব একটা করা হয় না। কিন্তু সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্যে হলেও, মাঝেমধ্যে আমলটা করা উচিত!

এন্টি ভাইরাস!

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অহরহ বিপদের সম্মুখীন হই। নাগরিক জীবনে বিপদের ঝুঁকি আগের তুলনায় শতগুণ বেশি। যে কোনও মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে, অপ্রত্যাশিত বিপদ। আচানক আঘাত!

মানুষের পক্ষ থেকেই বর্তমানে বিপদাপদের আশংকা বেশি। এছাড়া অন্য দিক থেকেও বিপদ আসতে পারে। সামান্য ক্ষুদে একটা মশার কামড়ও আমার জন্যে ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। ছোট্ট একটা পিঁপড়ার কামড় আমাকে শয্যাশায়ী করে তুলতে পারে। সামান্য একটা ইঁদুর আমার জন্যে বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। সামান্য একটা তেলাপোকা আমাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে!

বাথরূমে পা পিছলে আঘাত পেতে পারি। খাট থেকে নামতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পেতে পারি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে বেমক্কা মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারি! গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে পা মচকে যেতে পারে। আরও কতো কী!

এসব থেকে বাঁচার কি কোনও উপায় নেই? সবগুলো থেকে বাঁচা যাবে কি না, ঠিক বলা যাচ্ছে না, তবে নবীজি আমাদের জন্যে সুরক্ষামূলক কিছু ব্যবস্থা রেখে গেছেন। সামান্য কিছু কাজ! কাজ না বলে 'পাঠ' বলাই ভাল। আবদুল্লাহ বিন খুবাইব রা. বলেছেন:

-এক ঘোরতর অন্ধকারময় বৃষ্টিভেজা রাতে ঘর থেকে বের হলাম! নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোঁজে! তার সাথে সালাত আদায় করবো। খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে পেলাম! তিনি বললেন:

-বলো!

আমি কিছু বললাম না। আবার বললেন:

-বলো!

আমি কিছু বললাম না।

-বলো!

-কী বলবো?

قُلْ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

-তুমি প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস তিনবার ও সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিনবার করে পড়ে নিবে! তোমাকে 'সবকিছু' থেকে রক্ষা করবে! (তিরমিযী)

প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় ছোট ছোট তিনটা সূরা তিন-তিন করে মোট নয়বার পড়া-ই 'কুল্লা শাই'-সবকিছুর জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে! নবীজি তো তাই বললেন। কথাটা নবীজি বললেও, বাস্তবে কথাটা তো আল্লাহরই। রাব্বে কারীমই আমাদের সুরক্ষার জন্যে 'ব্যবস্থাপত্র' পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমরা যারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করি। বিপদজনক বিষয়ে গবেষণা করি। এমনকি ব্যতিক্রমী বিষয়ে লেখালেখি করি, তাদের জন্যে এর চেয়ে আশ্বস্তকারী 'প্রেসক্রিপশন' আর কী হতে পারে? এটা বাঁকানো সাপ চিহ্নিত প্যাডে লেখা 'ব্যবস্থাপত্র' নয়, সরাসরি আরশে আযীম থেকে আসা 'অব্যর্থ নিদান'!

ভাইরাস যারা বানায়, তাদের কাছেই থাকে এন্টি ভাইরাস! আল্লাহই বিপদ দেন। তার পক্ষ থেকে আসা উপায়ই হবে নিশ্চিদ্র 'বৈতরণী'! তো আর কথা কী, আজ থেকেই শুরু হয়ে যাক! এটা ক্যাস্পারাস্কি বা নরটন নয় যে, ক'দিন পরপরই এমবি খরচ করে আপডেট দিতে হবে! কোনও খরচ নেই! নিখরচা 'এন্টিডোট'! রেজিস্ট্রেশনের ঝামেলা নেই। সম্পূর্ণ ফ্রি!

পথের দাবী!

এখন তো শরৎ কাল। কাশফুল। পথের দাবী শব্দটার সাথেও 'শরৎ'-জড়িয়ে আছে। তবে আমরা আজ তেমন কোনও পথের দাবী নিয়ে আসিনি! আমরা এসেছি সত্যিকারের পথের দাবী নিয়ে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব সময় চেষ্টা করতেন: অন্যদেরকে কষ্ট না দিতে। সাহাবায়ে কেরামকেও নিষেধ করতেন।

মানুষকে কষ্ট দেয়ার কাজটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। মুখের কথা দিয়ে। হাতের আঘাত দিয়ে। পা দিয়ে। চোখ দিয়ে। এছাড়া আরও অনেকভাবে আমরা অন্যকে কষ্ট দিতে পারি বা অজান্তে কষ্ট দিয়ে ফেলতে পারি!

তেমনই একটা বিষয় হলো 'রাস্তায় বসা'। পথচারীদের পথচলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়ে, বসে বসে আড্ডা দেয়া।

إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ!" فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ:"فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا". قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ

-সাবধান! তোমরা রাস্তাঘাটে বসো না।

-আমাদের যে রাস্তায় না বসে উপায় নেই? রাস্তাই আমাদের বসার জায়গা! সেখানে বসে বসে আমরা আলাপ-আলোচনা করি!

-যদি রাস্তার ওপর নিতান্ত বসতেই হয়, তাহলে পথের 'হক' আদায় করো!

-পথের 'হক' কী?

-দৃষ্টি অবনত রাখা। অন্যকে কষ্টদানে বিরত থাকা। সালামের জবাব দেয়া। সৎ কাজের আদেশ করা। অসৎ কাজে নিষেধ করা (বুখারী)।

নবীজি পথের ওপর বসতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু অতীব প্রয়োজনে শর্তসাপেক্ষে বসার অনুমতিও দিয়েছেন। আর রাস্তায় বসা মানে এই নয়, পুরো রাস্তা দখল করে

বসা। মোটাদাগে গাড়ি-ঘোড়া চলাচলের ‘ফুরসৎ’ তো থাকতেই হবে! আমি রাস্তার এমাথা-ওমাথা দখল করে বসে গেলাম, আর এদিকে যানজট-জনজট লেগে গেলো, এটা কিছুতেই যৌক্তিক আচরণ হতে পারে না।

নবিজী পথের ওপর বসতে নিষেধ করেছেন। আবার অনুমতি দিয়েছেন: অন্যকে কষ্ট না দেয়ার কড়ারে! রাস্তা দখল করে মিটিং-মিছিল করলে যদি জনমানুষের কষ্ট হয়, সেটা অনেক বড় গুনাহ হয়ে যাবে। পীরানে পীরের আজীমুশশান ‘নূরানী’ মাহফিল হলেও, গুনাহ হবে! সামান্যমত গুনাহ করে, ইয়াব্বড় সওয়াব কামাবার অনুমতি ইসলাম দেয় না।

পথের ধারে বসতে নিষেধ করা হয়েছে, মানুষ ও সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাবিধানের জন্যে। এই হাদীসের আওতায় আরও কিছু বিষয়ও এসে যাবে:
= পাড়ার রোয়াকে বা গলির মুখে চা-দোকানে বসে বসে মানুষ গোনা, কে যায় কে আসে তা লক্ষ্য করা, তাদেরকে নিয়ে কটুকাটব্য করা, মেয়েদেরকে দেখে ‘টীজ’ করা!
= ঈযায়ে মুসলিম!

এমনকি আমি মসজিদে পরে এসে, জায়গা না পেয়ে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে গেলাম, মাসবুক হওয়ার কারনে সালামের পর দাঁড়িয়ে লম্বা কেরাত ধরলাম! এদিকে মানুষ বের হতে পারছে না। এটাও সুন্নাহবিরোধী কাজ!

ওজুখানায় প্রচন্ড ভীড়, একেকটা আসনের পেছনে তিনজন করে প্রার্থী দাঁড়ানো, আর এদিকে আমি মেসওয়াক করছি, ঢিমে তেতালায় গলা পরিষ্কার করছি, নাক ঝাড়ছি! একেক অঙ্গকে পাঁচবার করে ধুচ্ছি, আর দাঁড়ির ভেতর পারলে শ্যালো মেশিনই চালিয়ে দিই আর কি! আরে তুই কি ওজু করতে বসেছিস নাকি গোসল করতে? জামাত দাঁড়িয়ে গেছে, আর উনি ওজু প্রসব করছেন! এটাও অন্যের পথকে আটকে রাখার দোষে দুষ্ট হওয়ার আওতায় আসতে পারে!

আমি পরে এসে জামাত পেলাম না। একাকী নামাযের নিয়্যত বাঁধলাম। সামনের জন জামাতের সাথে নামাজ পড়ে, সুন্নাতের আখেরী বৈঠকে আছেন। আমি তার ঠিক পেছনে গিয়েই শুরু করলাম। এদিকে ও বেচারা নামাজ শেষ করে বসে আছে, বের হতে পারছে না। আর আমার নামাজে সে কি 'খুশু-খুযু'! কি রে খেয়াল করে খালি জায়গায় দাঁড়াতে পারলি নে? এটাও অন্যকে কষ্ট দেয়ার তালিকায় আসতে পারে!

দোতলার ছাদে বসে ফুরফুরে মেজাজে পান চিবুতে চিবুতে ওয়াক থোঃ করে নিচের রাস্তায় পিচিক করে পিক ফেললাম, অফিসে যাওয়ার সময় বাসার ময়লার ঝুড়ি নিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দিলাম! বিকট আওয়াজ করে গলার কফের ঘিনঘিনে বিশাল দলা রাস্তায় ফেললাম, সিগারেটের গোড়ালি না নিভিয়েই রাস্তায় ফেলে রাখলাম--- এককথায় অন্যকে কষ্ট দেয়া!

বাড়ি যাওয়ার সময়, বাড়ি থেকে ফেরার সময় পুকুরের মাছ থেকে শুরু করে, খোঁয়াড়ের ঝিমুনি ধরা মোরগ, নিজ ক্ষেতের মসুর ডাল সব নিয়ে ব্যাগ হয়েছে দশটা! বাসের বক্সে দেয়ার পর আরও অসংখ্য ব্যাগ হাতে রয়ে গেছে! ব্যাগগুলো রাখা হয়েছে বাসের করিডোরে! পেছনের যাত্রীদেরকে যেতে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে! এর মধ্যে মোরগটা পলিথিনের বাইরে মাথা বের করে কক করতে শুরু করেছে, একটু 'ইয়েও' করে দিয়েছে!
= পরিষ্কার 'ঈযায়ে মুসলিম'। মানুষকে কষ্ট দেয়া!

বাড়ির নারিকেলের খোসা, পাটগাছের 'খড়ি', ধানের খড়, শুকোনোর জায়গা নেই! সরকারী রাস্তা আছে না? ওখানেই মেলে দাও! যাত্রীবাহী বাস যাওয়ার সময় অগত্যা ব্রেক কষতে হয়! ঝাঁকির চোটে যাত্রীদের পেট থেকে প্রথম দিন খাওয়া 'শালদুধ'টুকু বেরিয়ে আসার উপক্রম!
= ঈযায়ে মুসলিম!

সরু গলি দিয়ে হেলেদুলে হাঁটছে তো হাঁটছেই, সিগারেট ফুঁকছে! একেবারে রাস্তার মাঝ বরাবর! দু'দিকের মানুষেরই চলাচলে কষ্ট হচ্ছে! সিঁড়ি বেয়ে নামছে, ফোন এলো আচানক! ব্যস অমনি দাঁড়িয়ে তিনি গুজগুজ শুরু করলেন! পেছনে মানুষের লম্বা লাইন!
-ঈযায়ে মুসলিম! পথের দাবী নষ্ট!

লোকটা হাঁটছে, একবার ডানদিকে যায়, আরেকবার বামদিকে! নাক বরাবর থাকছে না! খালি 'রুট' পাল্টাচ্ছে! পেছন থেকে বা সামনে থেকে আসা পথচারীদের গতি বারবার ব্যহত হচ্ছে! আরে ব্যাটা নির্দিষ্ট এক ছক ধরে হাঁট না!
-ঈযায়ে মুসলিম!

ব্যস্ত রাস্তা আটকে রেখেই উনি 'ইউটার্ন' নিচ্ছেন! পুলিশ নেই, ভাত খেতে গেছেন বা উনিও ডিউটি বাদ দিয়ে ম্যাসেনজারে 'চটকাচটকি' করছেন! হেডলাইট নিচু না করেই বোল্টের গতিতে গাড়ি দাবড়াচ্ছেন, বিপরীত দিক থেকে আসা চালকের সরাসরি চোখে গিয়ে আলোটা পড়ছে! বাধ্য হয়েই ব্রেক কষতে হচ্ছে! সামান্য ফাঁক পেয়েই ওভারটেক করার অপরিণামদর্শী অপচেষ্টা! দুই গাড়ির যাত্রীরাই ভয়ে এতটুকুন!
= নীট এন্ড ক্লীন 'ঈযায়ে মুসলিম'! সন্দেহ আছে?

হাটবার! প্যাকপ্যাকে হাস, কককককে মোরগা, ভ্যাঁ ভ্যাঁ ছাগ, হাম্বা হাম্বা গরু নিয়ে এসেছে! বিশ্বরোড পুরোটা বন্ধ করেই 'তারা' মহান 'হাটবার দিবস' উদযাপন করছেন! ওদিকে মাইলের পর মাইল 'জট' লেগে আছে!
= ঈযায়ে মুসলিম!

তাগড়া জোয়ান! নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই, উল্টো দিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছে! ঝিমুনিরত তোবড়ানো গালের চালক, বাঁক ফেরার সময় হরণ না দিয়েই সপাটে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে দিল! মুখোমুখি মোলাকাত হতে হতে হলো না! ইন্ডিকেটর না জ্বেলেই, সাঁৎ সোঁৎ ডানে-বামের গলিতে ঢুকে পড়লো, পেছনের গাড়িটা

পড়লো বেজায় সমস্যায়! বাসের হরণের আওয়াজ এমন বিদঘুটে ঘাঁকঘাঁক করা যে, রাস্তার মানুষ তো দূরের কথা, গরুটা পর্যন্ত দড়ি ছিঁড়ে পালানোর উপক্রম! অথবা হরণটা এতই মিঁউমিঁউ, বেড়ালও লজ্জা পাবে! পথচারীরা না শুনলে সরে দাঁড়াবে কিভাবে?

-ঈযায়ে মুসলিম!

বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ দিতে হবে, স্যুয়ারেজ লাইন ঠিক করতে হবে, পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, এখন? কাটো রাস্তা! জমিতে পানি দিতে হবে, কাটো রাস্তা! খুবলে খুবলে রাস্তাকে ঝাঁঝরা করে দাও! কাজ শেষ। এবার কোনওরকমে নালিটা মাটি-পাথর দিয়ে ভরাট করে দায় সারো! রিকশা যাওয়ার সময় চরম ঝাঁকুনিতে শরীরের কলকজ্বা খুলে ছিটকে পড়ার উপক্রম!

-ঈযায়ে মুসলিম!

ময়লা পরিষ্কার করতে হবে, রাতের অাাঁধারে পাইপ দিয়ে, সদর দরজা দিয়ে রাস্তার পাশের নর্দমায় এনে ফেলা হলো! দুর্গন্ধে পথচলতি মুসাফিরের নাড়িভূঁড়ি উল্টে আসার উপক্রম!

- ঈযায়ে মুসলিম!

ওভারব্রিজ আছে। চলন্ত সিঁড়িও লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। না ওটা দিয়ে যাওয়ার রুচি নেই। সেই আদি ও আসল: একটু ফাঁক পেলেই ভোঁ-দৌড়ে এপার থেকে ওপার! তুরন্ত গতিতে ধেয়ে আসা বাসটা হার্ডব্রেক কষতে বাধ্য হলো! ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা যাত্রীদের সে কি কষ্ট! গাড়ি আছে ভালো কথা, তাই বলে যত্রতত্র পার্কিং? উঁহু! পঁচা মবিল ব্যবহার? কিন্তু গাড়িরে হৌসপাইপ দিয়ে যে কালো ধোঁয়া বের হয়ে মানুষের ফুসফুস পুড়িয়ে দিচ্ছে?

-ঈযায়ে মুসলিম! কোনও শক্কো-শোবাহ! এনি সন্দেহ?

আরো কতো কতোভাবে যে আমরা অন্যকে কষ্ট দিই! ফিরিস্তি নথিভুক্ত করতে বসলে, রাত ফুরোবে মাগার নটে গাছটি মুড়োবে না!

= অন্যকে কষ্ট দিবো না, এটা মাথায় রাখলেই হয়।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৬৪

☂ বিকিকিনি!

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামাজিক সুসম্পর্ককে খুবই গুরুত্ব দিতেন। পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি জোর তাকিদ দিতেন! বেচাকেনার সময় কোনও পক্ষই যাতে লাভবান হতে পারে, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতেন।

কিছু পণ্যে সুনির্দিষ্ট বাজারদর থাকে না। ক্রেতা-বিক্রেতার দর কষাকষির পর ধার্য্য হওয়া মূল্যেই কেনাবেচা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে দরকষাকষি করতে গিয়ে অনেক সময় মনকষাকষিও হয়ে যায়। এমনটা যাতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই নবীজি বলে গেছেন:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

বেচাকেনা ও অন্যের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে উদার-সহনশীল ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দয়া করেন (বুখারী)

সামহ (سَمْحًا) বা উদার-সহনশীল হতে হলে, উভয় পক্ষকেই নিজের অবস্থান থেকে নেমে আসাটা জরুরী। ছাড় দেয়ার মানসিকতা থাকা আবশ্যক। নিজে লাভবান হয়ে, অন্যকে ঠকানোর মানসিকতা পরিহার করে চলা অপরিহার্য্য।

একই কথা মামলা-মোকাদ্দমার বেলায়ও খাটে। অন্যকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজে মামলা জেতার চিন্তা করা ঠিক নয়। ইনসাফের সীমায় থেকেই অন্য ভাইকে ছাড় দেয়া যায় কি না ভেবে দেখা! একটু ছাড় দেয়া গেলে, সেটাই হবে ‘সামা-হাত’। উদারতা। সহনশীলতা।

বিক্রেতা পরিচিত বলে, তাকে লজ্জায় ফেলে, জোর করে নামমাত্র মূল্যে খরীদ করা ঠিক নয়। ক্রেতা ভদ্র বলে, চড়া মূল্য হেঁকে, তাকে বিব্রত করা ভদ্রজনোচিত কাজ নয়। একজন ‘সামহ’-এর কাজ নয়।

একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা কখন ‘সামহ’ হতে পারবে?
= যদি শুধু নিজের লাভ নয়, অপর পক্ষের লাভের দিকেও নজর রাখা যায়। যদি পণ্য মেপে দেয়ার সময় ভালো ভালো দেখে বেছে দেয়া যায়। বাড়িতে আনার পর একটা বা দুইটা খারাপ দেখা গেলে সেটা মেনে নেয়া যায়!

একটাকা দামের একটা চকলেট কিনতে গেলেও আমরা ‘সামহ’ হয়ে উঠতে পারি। একখিলি পান কিনতে গেলেও আমরা ‘সামহ’ হয়ে উঠতে পারি। একটা দিয়াশলাই কিনতে গিয়েও আমরা ‘সামহ’ হয়ে উঠতে পারি। বাসের একটা টিকেট কিনতে গিয়েও আমরা ‘সামহ’ হয়ে উঠতে পারি।

এমনকি ক্রেতা বা বিক্রেতা যদি গরীব হয়, তাহলে ‘সামহ’ হয়ে ওঠার তাৎপর্য তো বহুগুণে বেড়ে যায়। শুধু কি তাই? বেচাকেনার সময়, ‘সামহ’ হওয়ার বিষয়টা মাথায় রাখলে, সামাজিক সুসম্পর্কের পাশাপাশি কত্তোবড় একটা সুন্নাত আদায়ের সওয়াবের ভাগীদার হতে পারি!

একজন রিকশাচালকের সাথেও আমরা সামহ হয়ে উঠতে পারি। একজন ফেরিঅলার সাথেও আমরা সামহ হয়ে উঠতে পারি। মাসিক ভাতা দেয়ার সময়, বাড়ির খাদেমের সাথেও আমরা সামহ হয়ে উঠতে পারি। বাসের অসহায় হেল্পারের সাথেও আমরা

সামহ হয়ে উঠতে পারি। বাজারের এক কোনে বসা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শাক-সবজি বিক্রেতার সাথেও আমরা সামহ হয়ে উঠতে পারি।

হাট-বাজারে যদি শুধু এই একটা হাদীস বাস্তবায়ন করা যায়, সামাজিক অশান্তির বিরাট একটা অংশ এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক সংকটের সিংহভাগই উধাও হয়ে যাবে। দারিদ্র্য বিমোচনের পেছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ভর্তুকি দেয়ার স্কীম হাতে নিতে হবে না।

আমরা কি পারি না, আজ থেকে 'সামহ' হয়ে ওঠার নববী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে? নবীজির আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্যে প্রস্তুত হতে? একজন সত্যিকারের 'সামহ' হয়ে উঠতে?

আসুন না, আমরা আজ থেকে একজন 'সামহ' মানুষে পরিণত হই! রাব্বে রাহীম 'রহম' করবেন! পেয়ারা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুশি হবেন যে! তার শাফা'আত নসীব তো হবেই!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৬৫

ইবনি লী বাইতান!

আমার জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করুন। কোথায়? জান্নাতে! আবার কোথায়! কথাটা আসিয়া (আ.)-এর। তিনি রাব্বে কারীমের কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন। এটা তো জান্নাতে ঘর নির্মাণের কথা! জান্নাতে আল্লাহ আমাদের জন্যে ঘর নির্মাণ করবেন। এজন্য আমাদের করণীয়? দুনিয়াতে আল্লাহর জন্যে ঘর নির্মাণ করা!

মদীনায় এসেই নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমেই একটা মসজিদ নির্মাণ করেছেন। কুবাপল্লীর মসজিদ। বোঝা গেলো, ইসলামি সমাজ গঠনে, মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম! রাষ্ট্র গঠনের আগে মসজিদ নির্মাণ।

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সেরা স্থান কোনটি? আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান কোনটি? কুইজের উত্তর একটা হাদীসে আছে:
أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا
মসজিদ হলো আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় স্থান। বাজার আল্লাহর সবচেয়ে অপ্রিয় স্থান (মুসলিম)।

আমরা দুনিয়াতে মসজিদ বানালে, প্রতিদানে কী মিলবে? উত্তরটা নবীজির কাছ থেকেই শুনি:
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ، بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ
আল্লাহর জন্যে মসজিদ বানালে, আল্লাহও তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর বানাবেন (মুসলিম)।

প্রথম শুনলে মনে হবে, এ-আর এমন কি, জান্নাতে একটা ঘর বানাবেন? আখেরাতে একটা ঘর থাকার কতো যে, গুরুত্ব, সেটা ফুটপাতে রাত কাটানো মানুষগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আমার নামায-রোজা কবুল হলো কি না, তার তো নিশ্চয়তা ে নই, কিন্তু একটা মসজিদ নির্মান করলে, জান্নাতে একটা আবাসন নিশ্চিত!

প্রশ্ন জাগে, আমি গরীব মানুষ! এত টাকা কোথায় পাবো? সমাধান নবীজি নিজেই দিয়ে গেছেন:
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
যে পাখির বাসার মতো বা তার চেয়েও ছোট একটা মসজিদ বানালো, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটা ঘর বানাবেন! (ইবনে মাজা)!

পাখির বাসার মতো মসজিদও হয়? এমন পিচ্চি মসজিদে নামায কে পড়বে? মানুষ না পাখি? তাহলে বোঝা গেলো, গোটা মসজিদ একাই বানাতে হবে এমন নয়। মসজিদের নির্মাণকাজে ‘টুটাফাটা’ অংশগ্রহণ করলেই হবে। আমি যদি অল্প কিছু টাকা দিয়েও শরীক হই, আমি গোটা মসজিদ নির্মানকাজের ‘প্রতিদান’ পেয়ে যাবো।

এজন্য বড়লোক হওয়ার প্রয়োজন নেই। পথের ফকিরও মসজিদ নির্মাণে শরীক হতে পারে। কয়েকটা টাকার বিনিময়ে, সেও হয়ে যেতে পারে, জান্নাতে বিশাল আলীশান প্রাসাদের সন্তুষ্ট মালিক!

পথের ধারে কোথাও নতুন মসজিদ নির্মান হতে দেখলেই, পকেটে হাত দেয়ার অভ্যেস করে ফেলা যায়। হাদীসটা মনে রেখে, আজ থেকেই আমরা জান্নাতে ‘কনস্ট্রাকশন ফার্ম’ খুলে বসতে পারি। একবার দান করবো, নতুন একটা সাইট ওপেন হয়ে যাবে। দুনিয়াতে একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানী দাঁড় করাতে কতো কতো কাঠখড় পোড়াতে হয়! আর জান্নাতে?
= স্রেফ পকেটের সামান্য টাকা ব্যয় করেই, বিলাসবহুল প্রাসাদের মালিক বনে যেতে পারি। রহি্যাব সদস্য হতে হবে না। এলাকার মাস্তানদরে বখশশি-বখেড়া দিতে হবে না। রাজউক থেকে প্ল্যান পাস করিয়ে নেয়ার ঝামেলা নেই। সয়েল টেস্টের মাথাব্যথা নেই। বায়না-রেজিস্ট্রি-নামজারির ঝক্কি নেই।

আল্লাহর ঘরনির্মাণে শরীক হলাম, সাথে সাথে জান্নাতে একটা ‘অভ্রংলিহ-অভ্রভেদী-হাইরাইজ-আকাশছোঁয়া-গগনচুম্বী’ প্রাসাদের মালিক হয়ে গেলাম!

জান্নাতের টিকেট!

একজন মুমিনের চূড়ান্ত চাওয়া কী? জান্নাতে প্রবেশ করা। কেউ কেউ বলতে আখেরাতে আল্লাহর দীদার লাভ করা। সেটাও জান্নাতে যাওয়া ছাড়া হবে না। জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিবন্ধক হলো: গুনাহ। আমাদের জীবনযাত্রা এমনই, গুনাহ বন্ধ করা যায় না। শতচেষ্টাতেও কিভাবে যেন গুনাহ হয়েই যায়।
এদিকে ফিরিশতারাও থেমে নেই। তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিশেব লিখে চলছেন। যাররা পরিমাণ ভুল করলেও রেহাই নেই। নিস্তার নেই। খসখস করে খাতায় নথিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! পাশাপাশি আমাদের জান্নাতগমনও দুরূহ হয়ে যাচ্ছে!

নবীজি সা. আমাদেরকে ভীষণ ভালোবাসতেন। আমাদের মুক্তির চিন্তাতেই তিনি বেচাইন থাকতেন। কিসে আমরা নাজাত পাবো, কী করে আমরা জান্নাত পাবো, অনুক্ষণ এই চিন্তা-ফিকিরেও ডুবে থাকতেন। তিনি জানতেন আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো না। আমরা দুর্বল। তাই তিনি ব্যবস্থা রেখে গেছেন! একটা দু'আ শিখিয়ে গেছেন। সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার জন্যে। দু'আটা পড়লে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেবেন!
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ"،

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার প্রতি কৃত ওয়াদা রক্ষার চেষ্টা করছি। ও আপনাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির অধীনে থাকার চেষ্টা করছি! আমার মন্দকর্মের ব্যাপারে আপনার পানাহ চাই! আমার প্রতি আপনার নেয়ামতের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করছি। আমার পাপের কথাও স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারবে না।

مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ

দিনের বেলায় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দু'আটা পড়লে, সন্ধ্যার আগে মারা গেলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে রাতের বেলায় দু'আটা পড়লে, সকাল হওয়া আগে মারা গেলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে! (বুখারী)

দু'আটার নাম 'সাইয়েদুল ইস্তেগফার' কেন হলো? ইস্তেগফারের নেতা? সাধারণত ইস্তেগফারগুলো হয়, সরাসরি ক্ষমাপ্রার্থনা দিয়ে। শুরুতে অন্য কোনও কথা থাকে না। এই দু'আর শুরুতেই তো তাওহীদের কথা। বান্দার গুনাহের স্বীকারোক্তি। নেয়ামত লাভের স্বীকারোক্তি। এসব বলতে বলতে, বান্দাহর মধ্যে বিনয়নম্র ভাবের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বান্দার এই কাকুতি-মিনতি অবস্থা দেখে খুশি হয়ে ক্ষমা করে দেন।

এজন্যই নবীজি সা. দু'আটা পড়ার জন্যে একটা শর্তারোপ করেছেন:
-দৃঢ়বিশ্বাস! হাঁ, একীনের সাথে দু'আটা পড়া শর্ত। নাহলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। ক্ষমা পেতে হলে, দু'আটা বুঝে বুঝে পড়তে হবে। মনে মনে নির্দ্বিধ বিশ্বাস নিয়ে পড়তে হবে। তাহলেই জান্নাতে যাওয়ার মতো ক্ষমা লাভ হবে।

দু'আটা সকাল ও সন্ধ্যায় একবার করে পড়লেই চলবে।

আল্লাহুম্মা! আনতা রাব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত'তু, আউযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া, ওয়া আবূউ লাকা বিযামবি ফাগফির লী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা!

খেয়ে ক্ষমা!

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত কী? রিযিক। রিযিক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে রিযিক বলতে আমরা সাধারণত খাবার বুঝি! আল্লাহ তা'আলাও খাবার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: তারা যেন এই কাবার রবের ইবাদত করে? কেন ইবাদত করবে? কারণ, তিনি তাদেরকে আহার দান করেন, বিপদে নিরাপত্তা দান করেন। তারা বছরে দুইবার নিরাপদে 'বিজনেস ট্যুর' করতে পারে। কেউ তাদেরকে বাধা দেয় না (কুরাইশ)

খাবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হলে, আল্লাহর ইবাদত প্রসঙ্গে খাবারের কথা আনতেন না। কাউকে আহার করালে, বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, প্রশংসা করাটা সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়েছে। এটা আসলে সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলাও বিষয়টা পছন্দ করেন। এক্ষেত্রে নবীজির সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনাই আছে:
مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ
খাবার শেষ করে যে বললো:
الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এই খাবার খাইয়েছেন, আমার কোনও প্রকার চেষ্টা-ক্ষমতা ছাড়াই তিনি আমাকে এই রিযিক দান করেছেন!
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
তাহলে তার পূর্বেকার (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে! (তিরমিযী)।

সুবহানাল্লাহ! অবিশ্বাস্য! এই ছোট্ট একটা দু'আ পড়লেই এত বড় প্রতিদান! আমরা দিনে কয়বার খাই? তিনবার তো বটেই! নিদেনপক্ষে দুইবার তো অবশ্যই! তিনবার করে প্রতিদিন দু'আটা পড়লে, আমলনামায় গুনাহ বলে কিছু থাকবে? এমন সাফসুতরো আমলনামা নিয়ে কবরে যেতে কোনও ভয় লাগার কথা?

শুধু কি ক্ষমা? দু'আটার মধ্যে আল্লাহর প্রশংসাও আছে। প্রশংসা এক প্রকারের শুকরিয়া। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ নেয়ামত বাড়িয়ে দেবার জোর আশ্বাস দিয়েছেন। দু'আ এক কিন্তু প্রাপ্তি অনেক!

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানি হা-যা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরে হাওলিম মিন্নী ওয়া লা কুউয়াহ!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৬৮

সুরভিত জুমু'আ!

'আতর' শব্দটাতেই কেমন যেন আরাম আর সুখ জড়িয়ে আছে। আতর হলো ফুটফুটে শিশুর মতো! দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হয়। আতরের শিশিও দেখলেই হাত আর মন নিশপিশ করতেই থাকে! একছিলিম লাগিয়ে নিই না!

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঠিকই আমাদের মনের কথা জানতেন। এটা ঠিক, তিনি মনের দিকে চেয়ে কোনও বিধান দিতেন না। আল্লাহর ইশারাতেই সবকিছু করতেন। ইসলামের বড় বড় বিষয়গুলোতেই একটা 'ব্যষ্টি' ব্যষ্টি ভাব আছে। নামায পড়তে গেলে জামাত জরুরী। কুরবানি করতে গেলে, গোশত অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া ভাল! একা একা থাকা ও আত্মচিন্তায় অনুক্ষণ ডুবে থাকা ইসলামের মানশা নয়। ইসলামে বলে আমরা সবাই এক দেহের মতো বাঁচবো।

জুমু'আ অর্থ? জমায়েত। গরীবের ঈদের দিন। ধরা যাক কোথাও বসে আছি। দলবেঁধে। এমন সময় কেউ একজন এলো। সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়লো এক অপার্থিব সুবাস! মনে কেমন লাগবে? যত কাঠখোট্টা আর নিরসই হোক, একটু হলেও মনে রঙ লাগবে! এ তো গেলো স্বাভাবিক অবস্থা!

গরম কাল। ভ্যাপসা তাপে সবাই জবজবে হয়ে আছে। ফ্যানের বাতাস কটু গন্ধ নাকে এনে আছড়ে ফেলছে। কিছু বলাও যাচ্ছে না, সওয়াও যাচ্ছে না। এমন মুহূর্তে নাকের কাছে একটা ফুল ধরলে কেমন লাগবে?

আমরা যখন মসজিদে, জুমা পড়তে যাই, একসাথে অনেক মানুষ জমায়েত হয়। নফল পড়ি। তিলাওয়াত করি। বয়ান শুনি। সাথে যদি নাকের আশেপাশে সুগন্ধি বাতাসের আনাগোনা থাকে? ইবাদতে বাড়তি মনোযোগ আসে না?

নবীজি বলেছেন:
حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ
দুনিয়াতে নারী ও সুগন্ধি আমার কাছে প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর নামাযের মাঝে আমার প্রশান্তি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে (নাসায়ী)।

নবীজির কাছে 'আতর' প্রিয়! আমার কাছে কেন প্রিয় হবে না? নবীজির সব সুন্নাত পালন করতে না পারি, এ-সুন্নাতটা পালন করতে কোনও কষ্ট আছে? হাঁ, টাকা খরচার একটা ব্যাপার আছে! কিন্তু একটা সুন্নাত পালনের তুলনায় 'টাকাকড়ি' কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু?

আতর কেন ব্যবহার করা হয়? নিজের ভালো লাগার জন্যে। অন্যের ভালো লাগার জন্যে। অন্যের ভালো লাগাটা কখন হবে? যখন অন্যের সাথে মিশতে যাবো তখন। জুমু'আর দিনই হলো একসাথে জমায়েত হওয়ার দিন। তাই এই দিন আতর ব্যবহার করার মাহাত্ম্য বহুগুণ বেড়ে যায়:
إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

আল্লাহ জুমাবারকে মুসলমানদের জন্যে ঈদের দিন বানিয়েছেন। জুমার আগে গোসল করে নেয়া চাই। আর ‘সুগন্ধি’ থাকলে, একটু লাগিয়ে নেয়া উচিত। আর তোমরা অবশ্যই মিসওয়াক করবে! (ইবনে মাজাহ)।

নবীজি জুমার দিন আতর ব্যবহার করাকে কতোটা গুরুত্ব দিয়েছেন, আরেকটা হাদীস পড়লে বোঝা যাবে:
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ
জুমাবারে প্রাপ্তবয়স্কদের মিসওয়াক করে, গোসল সেরে নেয়া উচিত। সম্ভব হলে একটুখানি সুবাস ব্যবহার করে নেয়া। (নিজের না থাকলে) স্ত্রীর ‘ফর ওম্যান’ আতর থেকে হলেও একটুখানি লাগিয়ে যাওয়া ভালো!

নবীজি কী ঘরোয়া সুরে কথা বলে গেছেন! নিজের শিশিটা শেষ, সমস্যা নেই! ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে বা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকেই আজকের জন্যে চালিয়ে দাও! পরের সপ্তাহের জন্যে Perfumance তো আছেই! চিন্তা কি! আতর একদম পকেটে এসে সেঁধোবে!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৬৯

ট্রিলিয়ন ডলার সাদাকা!

যাহ, কেউ এত টাকা সাদাকা করতে পারে? কেন পারবে না? হিম্মত থাকলে ‘ট্রিলিয়ন’ ফ্রিলিয়ন কিছুই না। আর সত্যি কথা বলতে কি, এই ‘সাদাকা’ আমি-তুমি-আপনি-সে-তিনি সবার পক্ষেই সম্ভব। এবং প্রতিদিনই সম্ভব। এজন্য ফুটো পয়সাও লাগবে না। ইয়া আল্লাহ! কিভাবে কিভাবে? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

আল্লাহর নেয়ামতের সংখ্যা কতো? কেউ হিশেব করে বলতে পারবে না। পৃথিবীর সব কম্পিউটার মিলেও গুণে শেষ করতে পারবে না। কুরআনেই এটা ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا

যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, গুণে শেষ করতে পারবে না (নাহল: ১৮)।

আমরা অসীম নেয়ামতের সাগরে ডুবে আছি। চারদিকে শুধু নেয়ামত আর নেয়ামত। আমাদের করণীয় কী? প্রতিটি নেয়ামতের জন্যে শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কিন্তু এত নেয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবো? এ যে কঠিন এক কাজ! বলা ভাল অসম্ভব!

তাহলে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? না, তা হতে যাবে কেন? আমাদের পেয়ারা নবীজি সা. আছেন না! তিনি আমাদের জন্যে কোনও অসম্পূর্ণতাই রেখে যান নি:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

প্রতিদিন সকালে, শরীরের প্রতিটি অস্থিসন্ধি (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ)-এর জন্যে ‘সাদাকা’ দিতে হয়!

(-শরীরে অসংখ্য ‘অস্থিসন্ধি’ আছে! এত সাদাকা কিভাবে দেবো?

-চিন্তার কিছু নেই। সাদাকা শুধু টাকা দিয়েই দিতে হয় এমন নয়)

= প্রতিটি তাসবীহ একটি সাদাকাহ।

প্রতিটি ‘আলহামদুলিল্লাহ’ একটি সাদাকা।

প্রতিটি ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ একটি সাদাকা।

প্রতিটি ‘আল্লাহু আকবার’ একটি সাদাকা।

সৎকাজের আদেশ একটি সাদাকাহ।

অসৎ কাজে বাধাদান একটি সাদাকাহ।

(আরো সহজ হলো) এই কাজগুলোর কোনওটা না করলেও, সকালে শুধু দুই রাকাত সালাত আদায় করলেই, যথেষ্ট হয়ে যাবে! (মুসলিম)!

আল্লাহু আকবার! আমার পেয়ারা নবীজি আর কতো সহজ করে দিবেন? আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা এত্ত সুন্দর একটা 'শরীর' পেয়েছি। শরীরের প্রতিটি অংশের জন্যেই আলাদা আলাদা শোকর আদায় করা দরকার। সাদাকা আদায় করা দরকার!

সাদাকা দেয়াটা বিবেকের দায়ও বটে। এতবড় নেয়ামত এমনি এমনি ভোগ করবো! কিন্তু নেয়ামতের বিনিময়ে নিজের করনীয় ভাবতে গেলে তো মাথাই ঘুরে ওঠে! বাপরে, তাহলে সারাদিন সব কাজ ফেলে 'জায়ানামাজ' নিয়ে বসে যেতে হবে যে। কয়েক হাজার দানাবিশিষ্ট ইয়া লম্বা তাসবীহ জপতে জপতে গলা শুকিয়ে ফেলতে হবে। না, এসবের কিছুই করতে হবে না। শুধু সূর্য ওঠার পনের মিনিট পর, মাত্র দুইটা রাকাত 'সালাতুত দু'হা' পড়ে নিলেই হলো। ব্যস নিশ্চিন্ত। অসংখ্য বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন 'গোল্ড দীনার' সাদাকা করার চেয়েও বেশি কিছু, এক নিমিষে হয়ে যাবে! সাদাকা করার টাকা কই, এ-প্রশ্ন নিয়ে হাহুতাশ করতে হবে না।

নবীজি সব সময় এই নামাযের প্রতি তাকিদ দিতেন। সাহাবীগনকে পইপই করে বলতেন। আবুদ্দারদা রা. বলেছেন:
أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: "بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ
আমার হাবীব আমাকে তিনটা কাজ করার ওসীয়ত করেছেন। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, কিছুতেই আমলগুলো ছাড়বো না!
১.প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রাখা।
২. দুইরাকাত সালাতুত দু‘আ বা ইশরাকের নামাজ পড়া।
৩. শোয়ার আগে বিতির পড়ে নেয়া। (মুসলিম)

সময়? সূর্য ওঠার দশ বা পনের মিনিট পর থেকে শুরু করে, জোহরের সময় শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগ পর্যন্ত!
সংখ্যা? দুই রাকাত হতে পারে। চার রাকাত হতে পারে। আট রাকাতও হতে পারে। আলোচ্য হাদীসে অবশ্য স্রেফ দুই রাকাতের কথাই এসেছে।

অাচ্ছা, প্রতিদিন না পারলেও, মাঝেমধ্যে কি সম্ভব নয়? কতক্ষণই বা সময় লাগবে, এই তিন কি চার মিনিট? সময়টা খুব বেশি? অর্জন যে কল্পনাতীত!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৭০

মসজিদে!

মসজিদ আল্লাহ তা‘আলার ঘর। সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান। পবিত্র স্থান। এখানে যেতে হলে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।
مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً
যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করলো অতঃপর ফরয সালাত আদায়ের জন্যে হেঁটে আল্লাহর ঘরে গেলো অতঃপর হেঁটে আল্লাহর ঘরে গেলো, তাহলে তার এক কদমে একটা গুনাহ মাফ হবে, আরেক কদমে একটা মর্যাদা বুলুন্দি হবে (মুসলিম)।

মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আমল। এ-কাজে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ তা‘আলা পুরষ্কারও ঘোষণা করেছেন। যত বেশি কদম হবে, ততবেশি গুনাহ মাফ হতে থাকবে, মর্যাদা বুলুন্দি হতে থাকবে। সময় হাতে থাকলে একটু দূরের পথ ধরে মসজিদে গেলে, প্রাপ্তির পরিমাণও বেড়ে যাবে।
শুধু মসজিদে আসার পথেই নয়, প্রবেশ করার সময়ও সুন্দর আমল আছে। একটা সদর্থক দু‘আও আছে। নবীজি বলে গেছেন:

-তোমরা মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়বে:
اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক: ইয়া আল্লাহ! আমার জন্যে আপনার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিন!
আর বের হওয়ার সময় পড়বে:
اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক: ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি! (মুসলিম)।

একজন মুমিনের প্রতিটি কাজই হবে নবীজির আদর্শে। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে শোয়া পর্যন্ত। নবীজি আমাদের জন্যে রহমতস্বরূপ। তার প্রতিটি কাজও আমাদের জন্যে রহমতস্বরূপ। নবীজির আদর্শকে লালন করে আমরা মূলত রহমতেরই ছায়ায় আশ্রয় নেই। আল্লাহ তা'আলাই এই রহমত বিতরণ করেন। আমরা টের পাই না, এই যা! আমরা অদৃশ্য এক রহমতের সাগরেই ডুবে আছি। এর বিনিময়ে আমাদের কিছুই করতে হয় না। আল্লাহ শুধু চান আমরা যেন তার রাসূলের রেখে যাওয়া সুন্নাতের অনুসরন করি।

মসজিদে যাওয়াটা যেন অভ্যেসের বশেই না হয়ে যায়। কিছুটা সচেতন মানসিকতা নিয়েই যেন যেতে পারি। সেটা কিভাবে?
ক: আমরা হাদীসটার কথা স্মরণ করবো। প্রতি কদমে গুনাহ মাফ হচ্ছে। আল্লাহর দরবারে আমার পদোন্নতি ঘটছে! এটাও আল্লাহর যিকির।
খ: শুধু তাই নয়, আমি আল্লাহর কাছে আরো রহমত কামনা করছি। এটাও একপ্রকার শোকর! আনুগত্য। ইবাদত। আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ ভীষণ খুশি হন!

বের হওয়ার সময়ও মনটাকে সজাগ রাখা:
ক: আমি আল্লাহর ঘর থেকে বের হচ্ছি।

খ: বাইরের সময়টা বরকতপূর্ণ হওয়ার জন্যে, আল্লাহর কাছে ‘অনুগ্রহ’ও কামনা করছি!
তিনি আমার চাওয়াকে ফিরিয়ে দিতেই পারেন না।

রহমতে মোড়া এক আজীব ঈর্ষণীয় যিন্দেগী একজন মুমিনের!

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৭১

আজীবন রোজা!

আমরা হয়তো খেয়াল করে থাকবো! এক ইবাদতের এক স্বাদ! এক রঙ! এক রূপ! সালাতের স্বাদ এক, সিয়ামের স্বাদ আরেক। ফজর সালতের ভাব এক, তারাবীহের স্বাদ আরেক। যাকাতের পরিতৃপ্তির ধরন এক, হজ্বের পরিতৃপ্তির ধরন আরেক!

সিয়াম এমন এক ইবাদত, প্রায় সব ধর্মেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধরন-প্রকরণে পার্থক্য থাকলেও মূল পদ্ধতি প্রায় এক: উপবাসযাপন! তার মানে এটা এক সার্বজনীন ইবাদত! পার্থক্য হলো, আমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় সিয়াম পালন করি, তারা মানবনির্দেশিত পন্থায় পালন করে। আমাদের সিয়াম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, তাদেরটা হবে না।

সিয়ামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
-এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিজ হাতে দেবেন। আর কোনও ইবাদতের ক্ষেত্রে এমনটা বলেন নি।
قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: সিয়াম ছাড়া আদমসন্তানের প্রতিটি আমলই তার নিজের জন্যে, সিয়াম আমার জন্যে, আমিই তার প্রতিদান দেবো! (বুখারী)

সিয়াম পালনে জাহান্নাম আমাদের থেকে এত দূরে সরে যাবে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্যে চমৎকার আমলটা রেখে গেছেন। আমাদের মুক্তির কথা চিন্তা করে। তিনি সিয়ামের ইবাদতটা বিভিন্নভাবে করে গেছেন। তার একটা হলো: প্রতিমাসে তিন রোজা! যাকে আইয়ামে বীজের রোজাও বলা হয়। চাঁদের ১৩-১৪-১৫তারিখের রোজা। এই দিনগুলোতে চাঁদের আলোতে রাতগুলো শাদা থাকে বলে: বীজ (শাদা) বলা হয়। নবীজি সা. বলেছেন:
مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখলে, আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাবেন (মুসলিম)।
হাদীসে ফি-সাবীলিল্লাহ বলা হলেও, হাদীসের ব্যাখ্যাকারগন বলেছেন: ইখলাস ও পরিপূর্ণ আনগত্যের সাথে ঘরে থেকে রোজা রাখলেও এই ফযীলত লাভ করা যাবে। জাহান্নামকে সত্তর খারীফ (শরৎ) দূরে সরিয়ে নেয়ার কথা বলে, নবীজি মূলত আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। রোজার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছেন। সামান্য পরিশ্রমেই অনেক বড় অর্জন করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

তিনরোজা সম্পর্কে নবীজি বলে গেছেন:
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ
আবু হুরায়রা রা. বলেছেন: আমার হাবীব (সা.) আমাকে তিনটি বিয়য়ের ওসীয়ত করে গেছেন। আমি আমৃত্যু এগুলো ছাড়বো না:
ক: প্রতি মাসে তিনরোজা।
খ: সালাতুত-দুহা (ইশরাকের সালাত)।
গ: বিতির আদায় করে ঘুমানো। (মুত্তাফাক)।

এই হাদীসে কোন তিনদিন নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। আরেক হাদীসে আছে:
يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ"

নবীজি সা. আবু যর রা.কে বলছেন: তুমি প্রতি মাসে রোজা রাখতে চাইলে: ১৩ ১৪ ও ১৫ পনের তারিখে রোজা রাখো! (তিরমিযী)।

তিনদিন রোজা রাখার মাহাত্ম্য কী?
مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

কেউ প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখার মানে, আজীবন রোজা রাখা! (তিরমিযী)

প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখলে আজীবন রোখার হিশেবটা কিভাবে হলো? সেটা কুরআনেই বলা আছে:
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
যে একটা নেককাজ করবে, তার জন্যে দশগুণ প্রতিদান থাকবে (আনআম: ১৬০)। তারমানে একদিন রোজা রাখাটা দশদিন রোজা রাখার সমান। একে দশ। তিনে ত্রিশ। এভাবে প্রতিমাসে তিনদিন রাখলে, সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব লেখা হয়ে যাবে। একবার আমল করা শুরু করলে, প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখা কিন্তু খুবই সহজ? কতো কতো আমল আমাদের থেকে ছুটে যায় সামথ্য না থাকার কারনে। কিন্তু তাওফীকে থাকা আমলগুলো কেন ছুটবে? আমরাও কি পারি না আবু হুরায়রা রা.-এর মতো করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে:
(لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ): আমি আমৃত্যু রোজাগুলো ছাড়বো না!

ভালবাসি আমি তোমাকে!

চারপাশে প্রিয় মানুষের উপস্থিতি থাকলে, নিশ্চিন্তে কাজ করা যায়। ঘরে-বাইরে সব জায়গায় পরিবেশটা অনুকূল হলে সময়-শ্রম-মেধার অপচয় রোধ করা যায়। অহেতুক ঝামেলা বাঁধে না।

নবীজি সা. চাইতেন সমাজে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক। সবার মধ্যে মিলমিশ থাকুক। সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি অটুট থাকুক। নবীজি বারবার বলতেন, একজন আরেকজনকে আল্লাহর জন্যে ভালবাসতে।

(এক)

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ

সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তা 'আলা কেয়ামতের দিন ছায়া দান করবেন।

এদের মধ্যে এক প্রকার হল:

وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ

দু' জন ব্যক্তি, আল্লাহর জন্যে একে অপরকে ভালবাসে, আল্লাহর ভালবাসার খাতিরে দু' জনে একত্রিত হয়। আল্লাহর ভালবাসার তাকিদেই দু' জনে বিচ্ছিন্ন হয় (বুখারী ৬২৯)।

(দুই)

নবীজি শুধু এটুকুতেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তার সামাজিক সৌহার্দ্য 'কার্যক্রম' কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার চমৎকার রূপরেখাও বাতলে গেছেন। আমাদের নবীজির প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য হল, তিনি 'তত্ত্ব' প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করতেন না। তত্ত্বের প্রায়োগিক দিকটাতেও সযত্ন নজর রাখতেন। নিজেই করে দেখাতেন। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। ভাইয়ে-ভাইয়ের মাঝে কিভাবে ভালবাসার বন্ধন তৈরি হবে?

إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ

কোনও ভাইকে ভাল লাগলে, তাকে জানিয়ে দেয়া:

-আমি আপনাকে ভালবাসি! (আবু দাউদ)।

লজ্জার কিছু নেই। সংকোচ কিসের। তাকে আমার ভাল লাগে। এই ভাল লাগাটা আল্লাহরই জন্যে। তাহলে এটা ইবাদত। এটা সুন্নাত। আবার তাকে ভালবাসার কথা বলাও সুন্নাত। সুন্নাত আদায়ে পিছিয়ে থাকব কেন? জড়সড় হব কেন? পিছিয়ে থাকব কেন?

(তিন)

এক সাহাবী নবীজির দরবারে বসা ছিলেন। পাশ দিয়ে আরেক সাহাবী হেঁটে গেলেন। উপবিষ্ট সাহাবী বললেন:

-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই মানুষটাকে ভালবাসি!

-তুমি তাকে ভলবাসার কথা জানিয়েছ?

-জ্বি না!

-যাও, তাকে (ভালবাসা) জানিয়ে আস!

সাহাবীটি দৌড়ে গেলেন। তার পছন্দের মানুষটাকে গিয়ে ধরলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন:

-(إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ) আমি আপনাকে আল্লাহর জন্যে ভালবাসি!

-(দু ‘আ করি), আপনি আমাকে যার জন্যে ভালবাসেন, তিনিও আপনাকে ভালবাসুন! (আবু দাউদ ৫১২৫)।

আমার সবকিছু কার জন্যে? আল্লাহর জন্যে। আমি একজন মুসলিম ভাইকে আল্লাহর জন্যেই ভালবাসব। পছন্দ করব। এই একটা সুন্নাতের বদৌলতে সমাজ, ঘর, রাষ্ট্রের চিত্র বদলে যেতে পারে। শুধু কি পার্থিব লাভ? আখেরাতেও এর বিরাট প্রতিদান পাওয়া যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সুখী দেখতে চেয়েছেন। সুখের ফর্মুলাও দিয়ে গেছেন। আমরা প্রয়োগ করব কি না, সেটা আমাদের যিম্মা! আজ পরীক্ষামূলক সুন্নাতটা আদায় করেদেখতে পারি!

ভাইকে ভালবাসি বলতে কি আর বাড়তি খরচ আছে! অন্য ‘কিছুকে’ ভালবাসি বলতে গেলে নানা ফ্যাচাং! ভাইয়ের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ‘পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত’ | ১০০% হালাল।

একটি সুন্নাহকে বাঁচাবো বলে: ৭৩

সকাল সন্ধ্যার সুরক্ষা!

বর্তমানে মানুষ মনের শান্তির জন্যে কত কিছু করে। ধ্যান করে। মেডিটেশন করে। যোগসাধনা করে। নিজের নিরাপত্তার জন্যে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নবীজি সা.-ও নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্যে বিভিন্ন আমল করতেন। দু ‘আ পড়তেন। দু ‘আগুলোর কথা হত অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। দু ‘আবাক্যগুলোর শব্দে শব্দে ছত্রে ছত্রে বিনয় নম্রতা ঝরে পড়ত। প্রকাশ পেত আল্লাহ তা ‘আলার একত্ব। মহত্ব।

সন্ধ্যা নামলে নবীজি পড়তেন:
أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ
আমরা সন্ধ্যায় উপণীত হয়েছি। সমস্ত ক্ষমতাও আল্লাহর কুক্ষিগত হয়েছে। প্রমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। তার কোনও শরীক নেই। রাজত্ব তার। প্রশংসাও তার। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।
হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার কাছে এ-রাতের সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি। রাতের পরে যত কল্যাণ আছে, তাও কামনা করছি।
এই রাতের সমস্ত অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাতের পরে আসা সমস্ত অকল্যাণ থেকেও মুক্তি কামনা করছি। আমি অলসতা থেকে, কষ্টকর বার্ধক্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকেও পানাহ চাচ্ছি।

ভোর হলেও নবীজি দু ‘আটা পড়তেন। শুরুতে বলতেন:
أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ
আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ কুক্ষিগত হয়েছে।
(আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.| মুসলিম)

এগুলো নিছক কিছু কথা নয়। আল্লাহর তাওহীদের স্বীকারোক্তি। আসমান যমীনের স্রষ্টা একমাত্র তিনিই, এর স্বীকারোক্তি। নিজেকে কী অসহায় বানিয়ে আল্লাহর কাছে দু ‘আ চাইতেন পেয়ারা নবীজি!

নবীজি এই দু ‘আয় অনেক কিছু চেয়েছেন,
ক. দিনরাতের সম্ভাব্য সমস্ত কল্যাণ কামনা করেছেন। সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্তি চেয়েছেন। দিনরাতের কল্যাণ ও অকল্যাণই নয় শুধু, ভবিষ্যতের কথাও বলতে ভোলেননি।
খ. শুধু তাই নয়, দুনিয়া ছাড়িয়ে আখেরাতে মুক্তির প্রার্থনাও পাশাপাশিও করেছেন।
গ. কবরের বিপদ থেকে পানাহ চেয়েছেন।
মাত্র কয়েক লাইনে এতকিছু চাওয়া পাওয়ার সম্মিলন করা নবীজির পক্ষেই সম্ভব। নবীজি এমন দু ‘আ কেন করতেন? তাকে আল্লাহ তা ‘আলা এমনিতেই রক্ষা করবেন। দুনিয়াতে কবরে ও আখেরাতে? তিনি মূলত পড়তেন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে। পাশাপাশি উম্মতকে আমলটা শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আমরা চাইলেই সকাল সন্ধ্যা দু ‘আটা পড়ে নিতে পারি। ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)-এর সাথে দু ‘আটা পড়লে, ইনশাআল্লাহ, সব ধরনের বিপদাপদ বালা-মুসীবত থেকে আল্লাহ তা ‘আলা আমাদেরকে রক্ষা করবেন। কবর আযাব থেকে, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে?

দু‘আটা মুখস্থ করা সহজ, কিন্তু নিয়মিত পড়া বেশ কঠিন। মনের উপর জোর খাটিয়ে পড়তে পারলেই অবিশ্বাস্য উপকার!

পুষ্টিকর সুন্নাহ!

সারাদিনে কত কিছুই খাই। পান করি। তারপরও শরীরে শক্তি পাই না। শরীর দুর্বল দুর্বল লাগে। কাজেকর্মে উৎসাহ আসে না। এত খাবার যায় কোথায়? খাবারের একটা প্রভাব শরীরে অনুভব করব না? সুফল ভোগ করব না?

এসবের মূল কারণ বরকতহীনতা। নবীজি শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আমরা যেন খাবারের পর, বরকতের দু'আ করা করি।

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

কাফের খাবার খায় সাতপেটে, মুমিন খাবার গ্রহণ করে একপেটে।

(ইবনে উমার রা.| মুসলিম)

মি'আন (مِعًى) অর্থ নাড়িভুঁড়ি। কাফেরের খাবারে বরকত থাকে না। সেজন্য বলা হয়েছে, তার খাবার সাতটা ভুঁড়িতে চলে যায়। মুমিনের খাবার একটা পেটেই থাকে। কথাটা রূপকার্থে বলা হয়েছে। সব মুমিনের খাবারেও কিন্তু সমান বরকত হয় না। দু'আ পড়া আর না-পড়ার কারণে বরকতেও তারতম্য এসে যায়।

খাবারে বরকত আনতে হলে, খাবারের পর আল্লাহ তা 'আলার কাছে বরকতের দু'আ করতে হবে। নবীজি এমনটাই শিখিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, দুধ পান করার পরেও বরকতের দু'আ করতে শিখিয়েছেন। ইবনে আব্বাস চমৎকার ভঙ্গিতে শিক্ষাটা তুলে ধরেছেন,

-একদিন আমি আর খালিদ বিন ওয়ালিদ নবীজির সাথে মুলাকাত করতে গেলাম, আম্মাজান মায়মুনার বাসায়। আপ্যায়নের জন্যে একপাত্র দুধ আনা হল। আমি বসেছি নবীজির ডানে। খালিদ বিন ওয়ালিদ বামে। নবীজি দুধ পান করলেন। আমাকে বললেন,

الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا

এবার পানের পালা (নিয়ম হিশেবে) তোমার। তবে তুমি চাইলে স্বার্থত্যগ (ঈসার) করে, পালাটা খালিদকে ছেড়ে দিতে পারো।

-আপনার মুখছোঁয়া অবশিষ্ট খাবারের ক্ষেত্রে আমি ঈসার করতে আগ্রহী নই (مَا كُنْتُ أُوثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا)।

নবীজি তারপর মূল শিক্ষাটা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:
مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ
আল্লাহ তা ‘আলা যাকে খাবার খাওয়ান, সে যেন (খাবারের পর) বলে,
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ
আল্লাহুম্মা, এ-খাবারে আমাদেরকে বরকত দান করুন। এর চেয়েও উত্তম খাবার আমাদেরকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

নবীজি আরও বলেছেন,
وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ
আল্লাহ তা ‘আলা কাউকে দুধ পান করালে সে যেন বলে,
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ
আল্লাহুম্মা, এ দুধপানে আমাদেরকে বরকত দান করুন। বরকত বাড়িয়ে দিন।

নবীজি আমাদের শিক্ষক। শিক্ষকতার দায়িত্ব দিয়েই তাকে পাঠানো হয়েছে। দু’ টি সুন্নাহ একসাথে পেয়ে গেছি।

১: খাবারের পরের সুন্নাহ।

২: দুধপান পরবর্তী সুন্নাহ।

উভয় সুন্নাতই বরকত বৃদ্ধিকারী। পাশাপাশি আল্লাহর যিকির। দুনিয়া ও আখেরাত। নবীজির প্রতিটি সুন্নাতেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের উপকার নিহিত থাকে। দু ‘আ দু’ টির প্রকাশ ভঙ্গিতে আল্লাহ তা ‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতার একটা ভাবও ফুটে উঠেছে। শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পুরষ্কার কী হবে সেটা কুরআন কারীমেই আছে,
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ

এক: মেহমান আগে খাওয়া শুরু করবে, মেযবান পরে, এটা জরুরী নয়। নবীজি সা. আগে দুধ পান করেছেন।

দুই: পালাধর্মী খাবারে, একজন খাওয়ার পর ডানদিকের জনকে খেতে দেবে।

কত সহজ সহজ শিক্ষা। আমাদের পালন করতে কত গড়িমসি!